প্রতি বছর কাক এসে বাসা বাঁধে। বর্ষাকালে বেনেবৌ এসে বসে। রাতে কাল পেঁচা এসে ডাকে, রোজ কাঠবিড়ালি খেলা করে। ফি বছর ছেলেপিলেরা তাতে দোলনা টাঙায়। তাদের কলরব কল্লোল, তাদের উৎসাহ আনন্দ সেই আমগাছটির গায়ে গোড়ায় লুটিয়ে পড়ে।

প্রত্যেক বছর ঝড় বয়েছে। আমগাছ তাতে কেঁপেছে। তার ডালে-পাতায় পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছের নীচে পিঁপড়ে শিকার করতে পিঁপড়ে-বাঘ বেলে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসে থেকেছে। বাতাস তেমনি গাছ জড়িয়ে, ডাল দুলিয়ে বয়ে গেছে। সে গাছ অজর।

গাছ জানে না, বোঝে না। তাকে উপলক্ষ করে যে যা করে, যে যা ভাবে তার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নির্বিকার। দোলনা পাছে পড়ে যায় বলে তার গায়ে ভোমর করে মোটা প্যাঁচ আঁটা হয়েছে। মানুষ আর গাছ জীবনের বিভিন্ন প্রকাশ, কিন্তু দুইই পোষ মানে। পোষা মানুষ কাজের বেলায় কৃতঘ্ন হয়, পোষা গাছ সর্বদা কৃতজ্ঞ আর বাধ্য।

ঝড় আসে, আসবে। তাতে ভাবার কিছু নেই।

সকালবেলা বাড়িতে হইচই।—আরে ! দেখেছ, কাল রাতে আম গাছ ভেঙে পড়ে গেছে!— ভাই, ওঠ! —আরে গোপাল, ওঠ! আমগাছের দশা দেখেছিস?

সবাই ছুটে গেল আমগাছের কাছে। গোপাল দেখল আমগাছ পড়ে আছে মাটির উপরে তার দোলনা বাঁধা দড়ি তার ডালের নীচে চাপা পড়েছে । দাঁড়িয়ে থাকাতে যত উঁচু ছিল, পড়ে গিয়েও তার ডালপালা তত উঁচু হয়েই রয়েছে।

গোপাল ঘুরে ঘুরে দেখল গাছের একটা দিক উইয়ে অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে, ফোঁপরা হয়ে গেছে। আর অর্ধেক ভেঙে গেছে।

—কিরে গোপাল, ওষুধ দিয়ে পিঁপড়ে মারছিলি না? পিঁপড়ে থাকলে উই লাগত না। এত বড়ো গাছটাকে উইয়ে খেয়ে ফেললে। গেল —!

—পিঁপড়ে তো মোটে রইল না, উইয়ের রাজত্ব হলো। কাঁচা গাছটাকে ভোজ করে দিলে!

কাঠবিড়ালিগুলো দূরে ঘোরাফেরা করছিল।

—আর কী খাবি রে, কাঠবিড়ালি? আমগাছ মরে গেছে।

নদীতে স্নান করতে আসে-যায় যারা, পথে চলা পথিকেরা দাঁড়িয়ে যায়, বলে—কী ঝড়টা না হয়েছিল, এত বড়ো ফলন্ত গাছটা উপড়ে পড়ল! আহা! আহা!

গাছটা কত ভালো। পড়েছে যে, তা ঘরের উপর পড়েনি। বাড়ির উপরকার বিজলি বাতিটা ভাঙেনি। দিনের বেলা পড়েনি। ডালে কাকের বাসা তেমনি আছে। কালো কালো ছানাগুলো উড়তে শেখেনি, চ্যাঁ চ্যাঁ করছে।

সে গাছ আর নেই। ভারি বুদ্ধিমান গাছ ছিল। সেই হৃদয়বান আমগাছটি আর বেঁচে নেই। কাঠুরিয়া এসে কুড়াল দিয়ে গাছের পাবে পাবে টুকরো করে কেটে দিয়ে গেল। পাখির বাসাওলা ডালটি আর একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দিলো।

খবর কাগজে লিখেছিল—কটকে অর্ধরাত্রে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি। শহরের ভিতরে পুরীঘাটে আমগাছ উপড়ে পড়েছে। গাছটির মৃত্যু-সংবাদ খবর কাগজে বের হলো। কী কপাল জোর তার!

দুই দিন পরে সন্ধ্যাকালে গোপালবাবু কাকে নিজের বাড়ির নিশানা দেবার সময় বলছিলেন—পুরীঘাট পুলিশের ফাঁড়ির পশ্চিম দিকে গেলে যেখানে প্রথম আমগাছ পাবেন—না না, ভুল বললাম, সে আমগাছটি পড়ে গেছে এই ঝড়ে।

আষাঢ়ের ঝড় আপন পরাক্রম দেখাতে লুটে নিল একটি নিরীহ নিরপরাধ আমগাছকে, তায় আবার সে ছিল দুর্বল, উইয়ে খেয়েছিল। কিন্তু সে বাড়ির সেই মানুষদের একটি বন্ধু ফাঁকি দিয়ে চলে গেল —সেই ঝড়ের রাতে।

হাতেকলমে

রাজকিশোর পট্টনায়ক (জন্ম ১৯১৬) : ওড়িয়া সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ লেখক ও গল্পকার। ঔপন্যাসিক হিসেবেও তিনি সমান জনপ্রিয়। পেশাতে আইনজীবী। একজন নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধক। আধুনিক জীবনের নর-নারীর মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনায়। তাঁর লেখা বিশিষ্ট গল্পগ্রন্থগুলি হলো *পথুকি, তুঠ পাথর, ভড়াঘর, নিশান খুন্ট, পথর ঢিমা*। আর উপন্যাসগুলির মধ্যে *অসরন্তি, সিন্দুর গার, স্মৃতির মশাণি, চলাবাট* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাঠ্য *ফাঁকি* গল্পটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ারদার।

১.১ রাজকিশোর পট্টনায়ক কোন ভাষার লেখক?

১.২ তাঁর লেখা দুটি গল্পের বইয়ের নাম লেখো।

২. **সন্ধিবিচ্ছেদ করো :**

সন্দেহ, আষ্টেক, প্রত্যেক, সম্পূর্ণ, নিরপরাধ, দুর্বল।

৩. **প্রতিশব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্য রচনা করো :**

বাড়ি, ছেলে, রাস্তা, পাথর, গাছ, বন্ধু, নদী।

৪. **নীচের বাক্যগুলি থেকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া বেছে নিয়ে লেখো :**

৪.১ এটুকু জমি খালি রাখা যাক।

৪.২ আগে গাছ লাগাব।

৪.৩ কোঁদল লাগবে, বাইরের কোঁদল এসে ঘরে ঢুকবে।

৪.৪ মায়ে-পোয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল, বিশেষ আলোচনার জন্য।

৪.৫ সকালে গোপাল আর গোপালের মা উঠে প্রথমেই গেল আমগাছ দেখতে, গাছ নেতিয়ে পড়েনি তো?

৫. **সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া চিহ্নিত করো :**

৫.১ বাবা আমগাছ নিয়ে পাঁচিলের কাছে লাগাচ্ছেন।

৫.২ খুব হয়েছে, মা আর ছেলের একই রকম বুদ্ধি।

৫.৩ আপন চেষ্টাতেই গাছটি বেড়েছে।

৫.৪ জল দেওয়া হলো।

শব্দার্থ : গুন্ঠ — প্রায় ১৭৪০ বর্গফুট জমি বা এলাকা। সন্দিগ্ধ — সন্দেহযুক্ত। গন্ডা — চারটি। কোঁদল — ঝগড়া, বচসা। ফার্ম — খামার । ঠেকো — ঠেস, পড়ে যাওয়া আটকাতে অবলম্বন দেওয়া। সিধা — সোজা। ফি বছর — প্রতি বছর। কৃতজ্ঞ — উপকারীর উপকার মনে রাখে। পরাক্রম — বীরত্ব, বিক্রম।

৬. গল্প থেকে বেছে নিয়ে পাঁচটি অনুসর্গ লেখো। সেই অনুসর্গগুলি যোগে স্বাধীন বাক্য রচনা করো।

৭. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো:**
জাহাজ, গাছ, পোষ, ঝড়, পশ্চিম।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৮.১ কটক কোন নদীর তীরে অবস্থিত? ওড়িশার আরও একটি নদীর নাম লেখো।

৮.২ গোপালের বাবা প্রথমে কেন বাগানে ফুলগাছ লাগাতে চাননি?

৮.৩ আমগাছে কেন ঠেকো দিতে হয়েছিল?

৮.৪ গাছটিকে উইয়ে খেয়ে ফেলল কীভাবে?

৮.৫ গল্প অনুসারে কটকের খবরের কাগজে আমগাছটিকে নিয়ে কী সংবাদ বেরিয়েছিল?

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৯.১ 'একটু জমি খালি রাখা যাক' — প্রস্তাবটি কে দিয়েছিলেন? কেন তিনি এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

৯.২ 'গোপাল মুখ তুলে সন্দিগ্ধভাবে বাবার মুখের দিকে তাকাল।' — তার এই সন্দেহের কারণ কী?

৯.৩ 'তুই করবি বাগান!' — বাবা কেন এমন মন্তব্য করেন?

৯.৪ 'গাছটাকে আর দু'হাত ভিতরে লাগালে কত ভালো হতো।' — কোন গাছ? কেন বক্তার এমন মনে হয়েছে?

৯.৫ আমগাছটি কীভাবে গোপালবাবুর বাড়ির নিশানা হয়ে উঠেছিল?

৯.৬ গাছটি কীভাবে তাদের সাহায্য করেছিল বুঝিয়ে লেখো।

৯.৭ আমগাছটিকে ঘিরে বাড়ির সকলের অনুভূতির প্রকাশ গল্পে কীভাবে লক্ষ করা যায়?

৯.৮ 'সেই দিন থেকে গাছ হেলে পড়েছে পুবদিকে।' — কোন দিনের কথা বলা হয়েছে। গাছটি হেলে পড়ার কারণ কী?

৯.৯ 'ঠিক বন্ধুর মতই গাছ সব কথা লুকিয়ে রেখেছে।' — গাছটি কীভাবে গোপালের বন্ধু হয়ে উঠেছিল? কোন সব কথা সে লুকিয়ে রেখেছিল?

৯.১০ বিভিন্ন ঋতুতে আমগাছটির যে ছবি গল্পে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।

৯.১১ গাছটি কীভাবে পরিবারের সকলকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল?

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

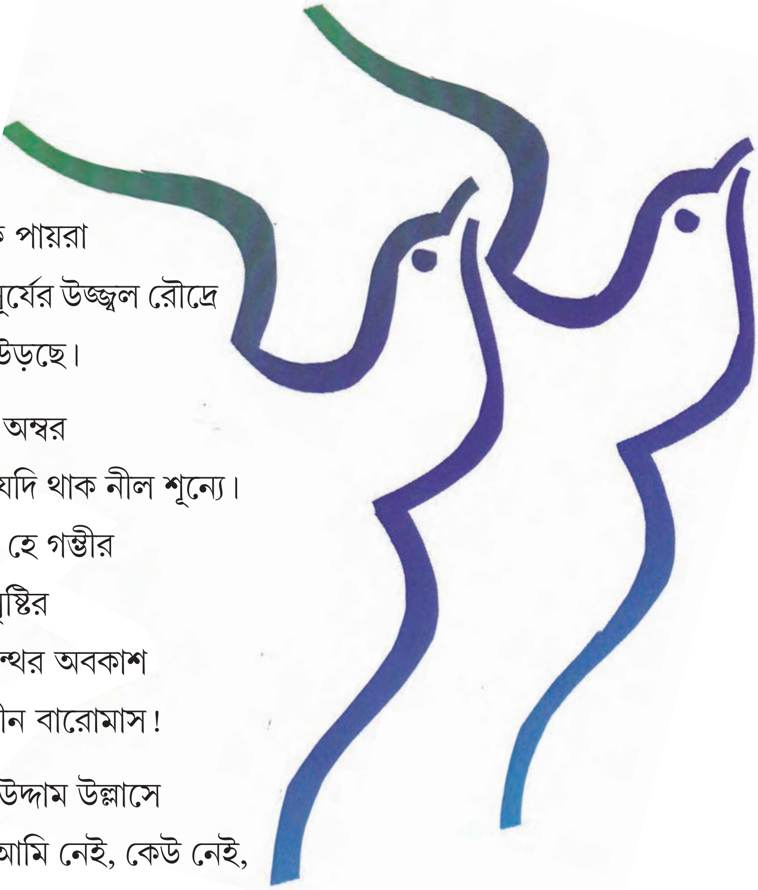

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।

নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহ তারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।
হে কাল, হে গম্ভীর
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ
হে অসীম উদাসীন বারোমাস!

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা।
আকাশি ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

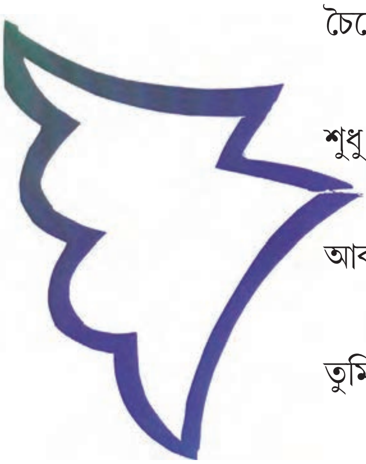

চিত্রগ্রীব

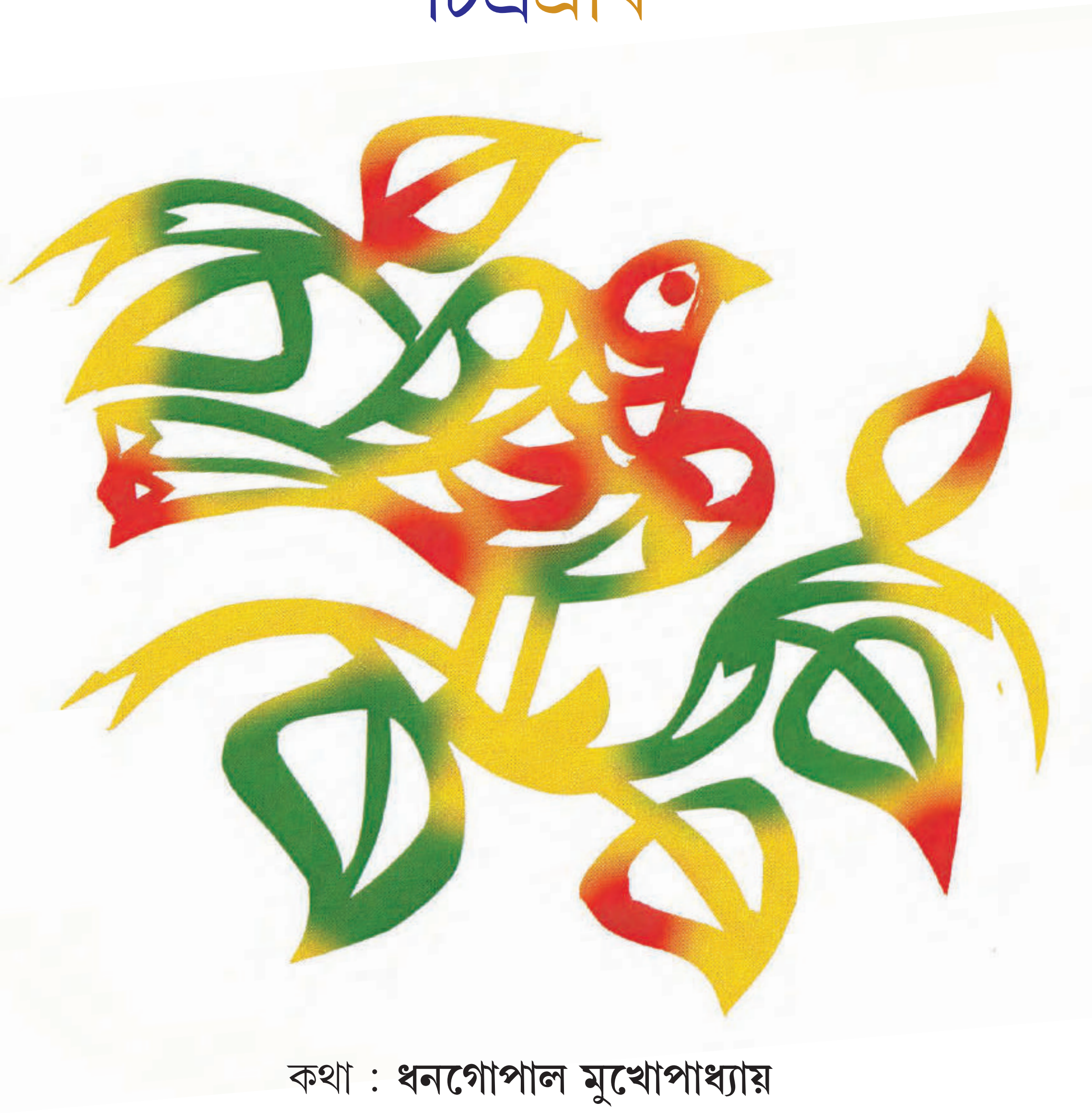

কথা : **ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়**

ছবি : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

আমার এক বন্ধুর নাম ছিল 'করী'—
সে একটি হাতি।
অপর বন্ধুর নাম ছিল 'চিত্রগ্রীব'—সে একটি
পায়রা। চিত্রিত বা রঙিন গ্রীবা যার তাকেই বলে
চিত্রগ্রীব।
প্রথমেই চিত্রগ্রীবের মা বাপের কথা বলি
শোনো।
তার বাপ ছিল
এক গেরোবাজ।
সে বিয়ে করেছিল তখনকার এক সেরা সুন্দরী পায়রাকে।
এক পুরানো বনেদি 'হরকরা' বংশে সেই সুন্দরীর জন্ম।
চিত্রগ্রীবকে জগতে আনবার জন্য
কবে ঠোঁট দিয়ে ডিমের খোলা
ভেঙে ফেলতে হবে, সে কথা
তার মায়ের অজানা নয়।

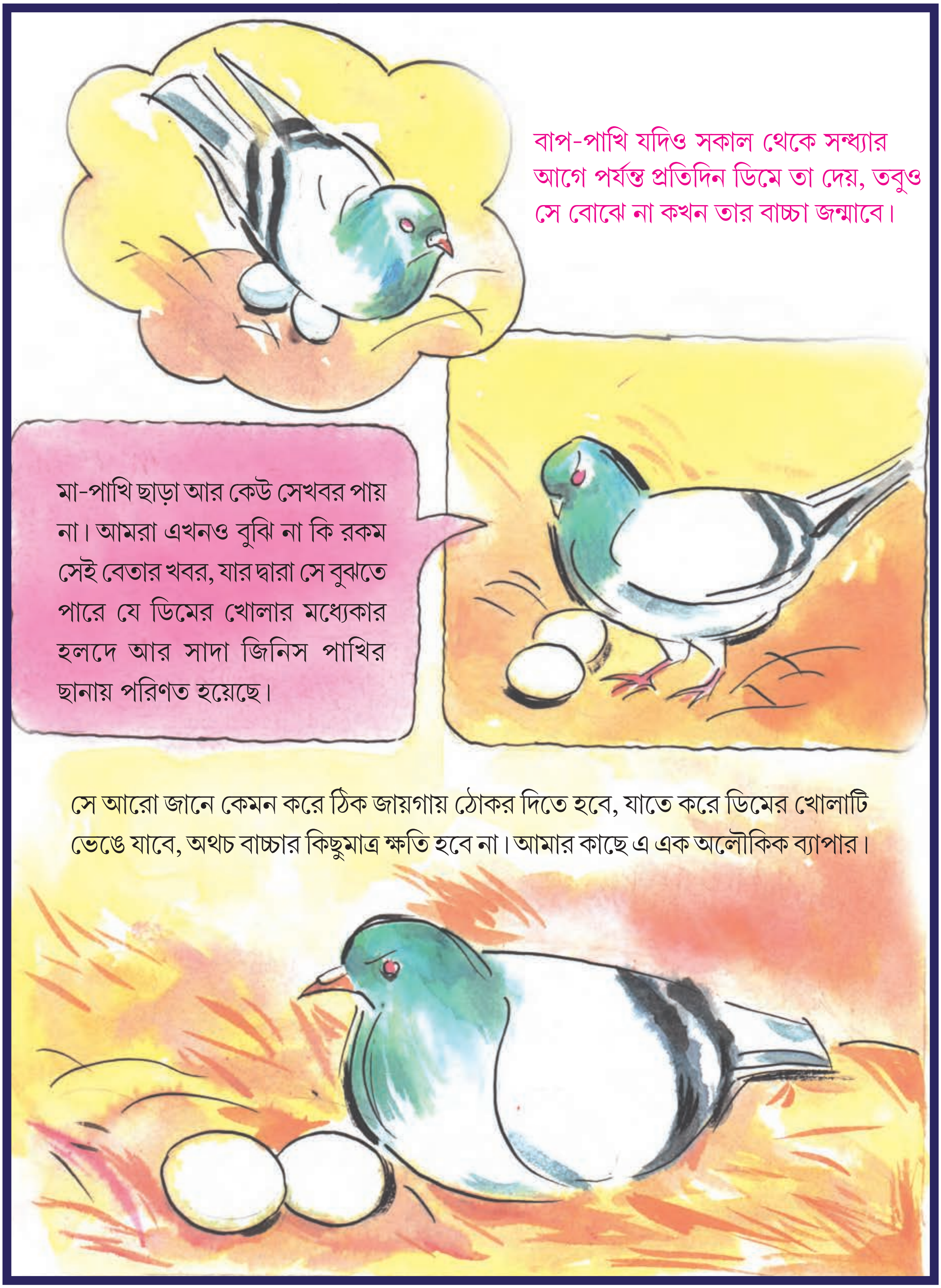
বাপ-পাখি যদিও সকাল থেকে সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত প্রতিদিন ডিমে তা দেয়, তবুও সে বোঝে না কখন তার বাচ্চা জন্মাবে।
মা-পাখি ছাড়া আর কেউ সেখবর পায় না। আমরা এখনও বুঝি না কি রকম সেই বেতার খবর, যার দ্বারা সে বুঝতে পারে যে ডিমের খোলার মধ্যেকার হলদে আর সাদা জিনিস পাখির ছানায় পরিণত হয়েছে।
সে আরো জানে কেমন করে ঠিক জায়গায় ঠোকর দিতে হবে, যাতে করে ডিমের খোলাটি ভেঙে যাবে, অথচ বাচ্চার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। আমার কাছে এ এক অলৌকিক ব্যাপার।

পাখির জগতে দুটি মধুর দৃশ্য আছে। প্রথম—মা যখন ডিম ভেঙে তার বাচ্চাকে প্রকাশ করে; দ্বিতীয়—যখন সে তাকে ডানা দিয়ে জড়িয়ে থাকে আর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে খাওয়ায়।
বাপ-মা দুজনেই চিত্রগ্রীবকে পরম স্নেহে জড়িয়ে থাকত।
মানুষের শিশুকে কোলে-পিঠে নিয়ে আদর করলে যা ফল, বাপ-মায়ের পাখার বেষ্টনে চিত্রগ্রীবেরও তাই হয়েছিল। অসহায় শিশু এর দ্বারা গরমে থাকে, আরাম পায়।
বেশ মনে পড়ে, জন্মের দ্বিতীয় দিন থেকে যখনই বাপ-মার মধ্যে একজন কেউ খোপের মধ্যে উড়ে আসত, তখন কেমন করে বাচ্চার ঠোঁট দুখানা আপনা আপনি ফাঁক হয়ে যেত;আর তার লাল টুকটুকে দেহ হাপরের মতো ফেঁপে ফুলে উঠত।

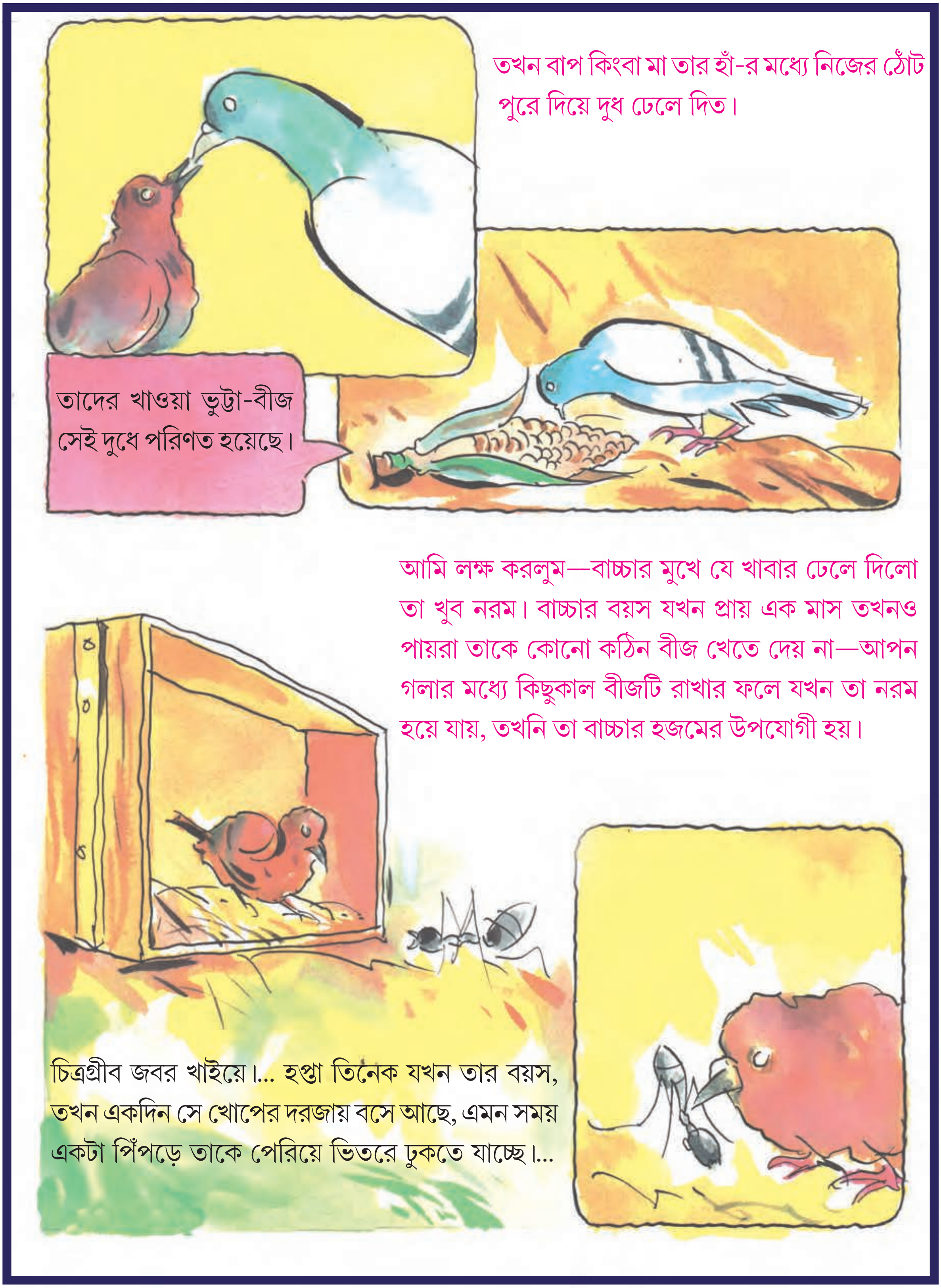
তখন বাপ কিংবা মা তার হাঁ-র মধ্যে নিজের ঠোঁট পুরে দিয়ে দুধ ঢেলে দিত।
তাদের খাওয়া ভুট্টা-বীজ সেই দুধে পরিণত হয়েছে।
আমি লক্ষ করলুম—বাচ্চার মুখে যে খাবার ঢেলে দিলো তা খুব নরম। বাচ্চার বয়স যখন প্রায় এক মাস তখনও পায়রা তাকে কোনো কঠিন বীজ খেতে দেয় না—আপন গলার মধ্যে কিছুকাল বীজটি রাখার ফলে যখন তা নরম হয়ে যায়, তখনি তা বাচ্চার হজমের উপযোগী হয়।
চিত্রগ্রীব জবর খাইয়ে।... হপ্তা তিনেক যখন তার বয়স, তখন একদিন সে খোপের দরজায় বসে আছে, এমন সময় একটা পিঁপড়ে তাকে পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে।...

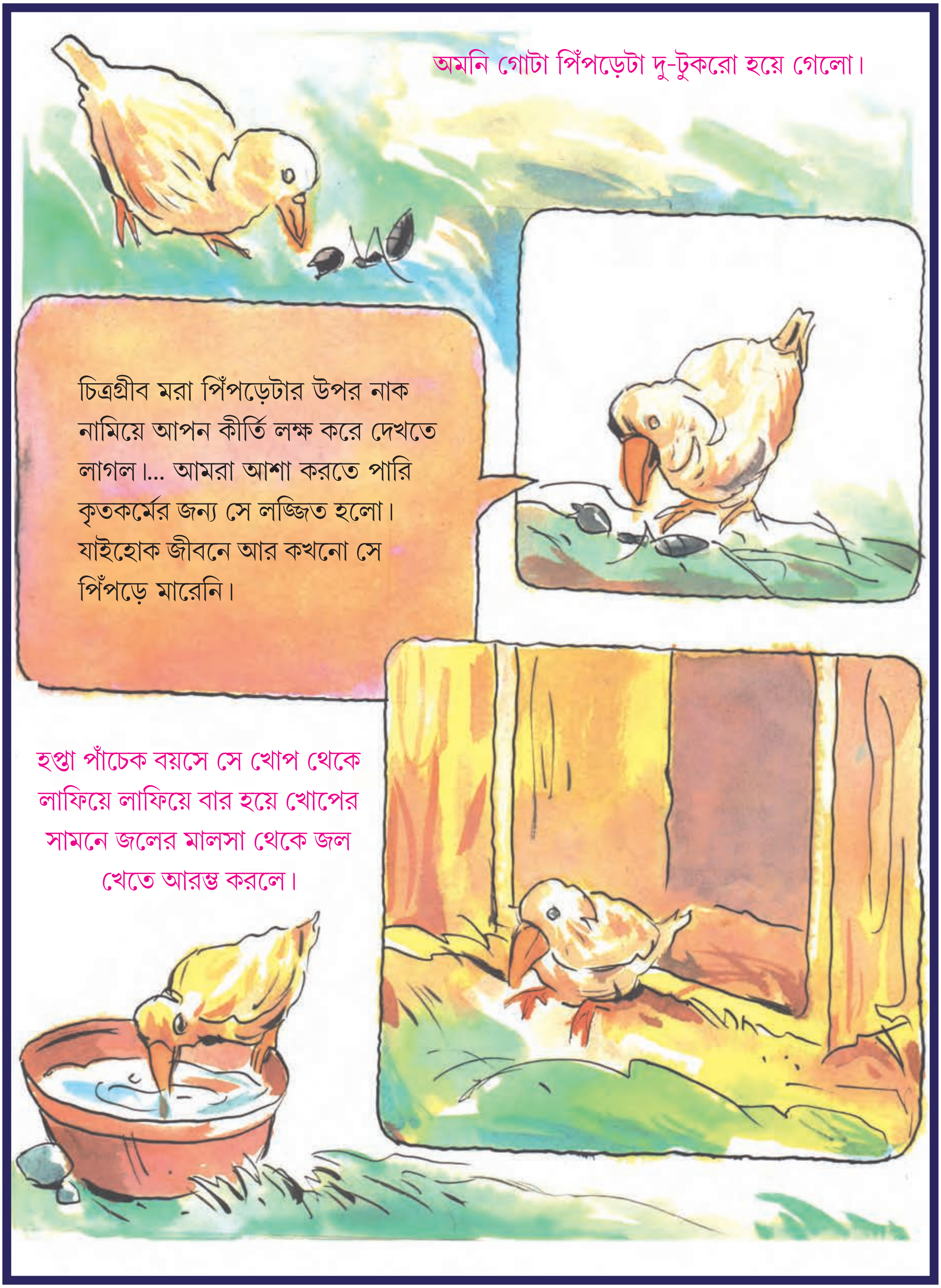
অমনি গোটা পিঁপড়েটা দু-টুকরো হয়ে গেলো।
চিত্রগ্রীব মরা পিঁপড়েটার উপর নাক নামিয়ে আপন কীর্তি লক্ষ করে দেখতে লাগল।... আমরা আশা করতে পারি কৃতকর্মের জন্য সে লজ্জিত হলো। যাইহোক জীবনে আর কখনো সে পিঁপড়ে মারেনি।
হপ্তা পাঁচেক বয়সে সে খোপ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বার হয়ে খোপের সামনে জলের মালসা থেকে জল খেতে আরম্ভ করলে।

ঠিক সেই সময় আমি এক আবিষ্কার করলুম। আগে জানতুম না পায়রারা কেমন করে আঁধির মধ্যে উড়েও অন্ধ হয় না।
নিয়ত চিত্রগ্রীবের বাপকে লক্ষ করতে করতে একদিন নজরে পড়ল তার চোখের উপরে একটি পাতলা পর্দা। ভাবলুম তার চোখে বুঝি ছানি পড়ছে---সে বুঝি দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছে।
আতঙ্কে হাতখানা বাড়িয়ে দিলুম, তাকে মুখের কাছে টেনে এনে ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্য। ... অমনি সে তার সোনালি চোখ খুলে ফেলে খোপের পিছন পানে টুপ করে সরে গেল।
তবুও তাকে আমি চেপে ধরে ছাদের উপর নিয়ে গেলুম। ...
তারপর বৈশাখের জ্বলন্ত সূর্যের আলোয় তার চোখের পাতা খুব ভালো করে পরখ করলুম। হ্যাঁ, রয়েছে বটে ঘুড়ির কাগজের মতো ফিনফিনে...

এমনি করে আমি জানতে পারলুম যে এই পর্দাটি তার চোখ রক্ষা করে—এরই সাহায্যে ওই পাখি আঁধির মাঝে বা সোজা সূর্যের পানে উড়তে পারে।
দু’ হপ্তা বাদে চিত্রগ্রীব ওড়ার শিক্ষা পেলে। পাখি হয়ে জন্মালেও সে শিক্ষা খুব সহজ হয়নি।
প্রথম শিক্ষা দেবে তার বাপ-মা---আমিও সাধ্যমত শেখাতে লাগলুম। প্রতিদিন কয়েক মিনিটের জন্য আমি তাকে কবজির উপর বসাই।
তারপর হাতখানা অনেকবার উপর নীচে করে দোলাতে থাকি। সেই অস্থির দাঁড়ের উপর আপনাকে স্থির রাখবার চেষ্টায় তাকে ঘনঘন ডানা খুলতে ও বন্ধ করতে হয়। এতে তার উপকার হয়, কিন্তু আমার শিক্ষা ওখানেই শেষ।

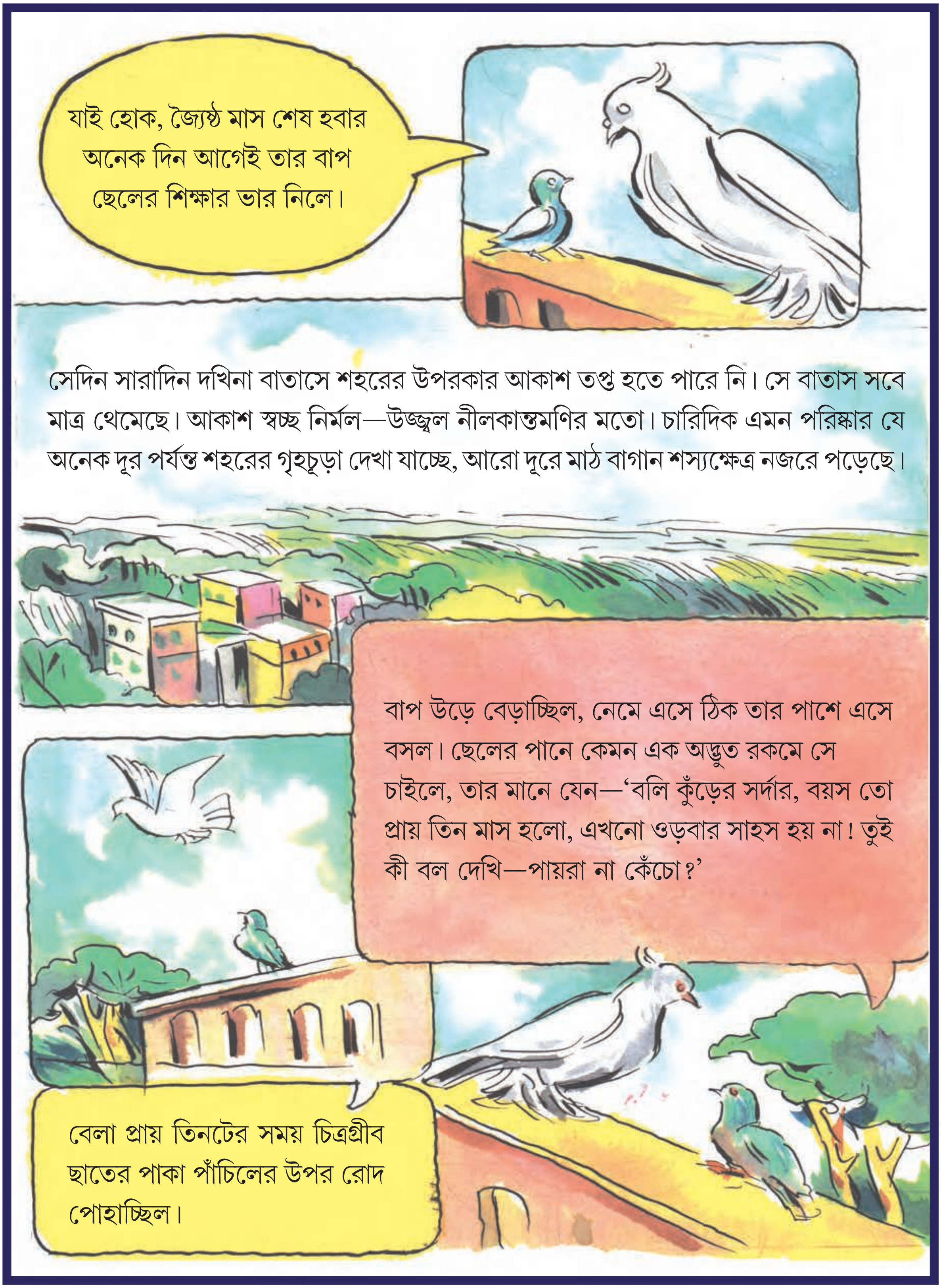
যাই হোক, জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হবার অনেক দিন আগেই তার বাপ ছেলের শিক্ষার ভার নিলে।
সেদিন সারাদিন দখিনা বাতাসে শহরের উপরকার আকাশ তপ্ত হতে পারে নি। সে বাতাস সবে মাত্র থেমেছে। আকাশ স্বচ্ছ নির্মল—উজ্জ্বল নীলকান্তমণির মতো। চারিদিক এমন পরিষ্কার যে অনেক দূর পর্যন্ত শহরের গৃহচূড়া দেখা যাচ্ছে, আরো দূরে মাঠ বাগান শস্যক্ষেত্র নজরে পড়েছে।
বেলা প্রায় তিনটের সময় চিত্রগ্রীব ছাতের পাকা পাঁচিলের উপর রোদ পোহাচ্ছিল।
বাপ উড়ে বেড়াচ্ছিল, নেমে এসে ঠিক তার পাশে এসে বসল। ছেলের পানে কেমন এক অদ্ভুত রকমে সে চাইলে, তার মানে যেন—‘বলি কুঁড়ের সর্দার, বয়স তো প্রায় তিন মাস হলো, এখনো ওড়বার সাহস হয় না! তুই কী বল দেখি—পায়রা না কেঁচো?’

কিন্তু গাম্ভীর্যের অবতার চিত্রগ্রীব কোনো জবাব দিলে না—স্থির হয়ে বসে রইল।
দেখে বাপের অসহ্য বোধ হলো, সে পায়রার ভাষায় বক্-বক্-কুম করে ছেলেকে ভর্ৎসনা করতে লাগল।
বকুনি এড়াবার জন্য চিত্রগ্রীব যতই সরে বসে, বাপও ততই এগিয়ে যায় ডানার ঝাপট দিয়ে—বক্-বকানিও থামে না।
চিত্রগ্রীব কেবলই সরে সরে বসতে লাগল, বুড়ো কিন্তু তাতে নিরস্ত হলো না, সে-ও তার সঙ্গে লেগেই রইল, বকুনির মাত্রাও বেড়ে গেল। ছেলেকে ঠেলতে ঠেলতে পাঁচিলের শেষ প্রান্তে এমন জায়গায় উপস্থিত করলে যে উপর থেকে গড়িয়ে পড়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না।
চিত্রগ্রীবের পা ফসকে গেল, আধ ফুট পড়তে না পড়তেই সে তার ডানা মেলে উড়তে শুরু করলে।

সকলের পক্ষেই কী আনন্দের কথা!

তার মা নীচে জলে ডুব দিয়ে বৈকালের প্রসাধন সম্পন্ন করছিল ...

ব্যাপার দেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ছেলের সঙ্গে উড়তে শুরু করলে। ছাতের উপর অন্তত মিনিট দশেক চক্রাকারে উড়ে তারা নেমে এল।

ছাদে পৌঁছে মা দস্তুরমাফিক ডানা গুটিয়ে স্থির হয়ে বসল। কিন্তু চিত্রগ্রীবের কথা অন্য; ছোটো ছেলে ঠান্ডা গভীর জলে গিয়ে পড়লে যেমন ভয় পায়, তারও তেমনি অবস্থা। তার সারা দেহ কাঁপছে, নেমে এসেও ছাতের উপর পা পাততে পারছে না, তাল সামলাবার জন্য ডানা ঝটপট করে সে পিছলে বেড়াতে লাগল— পায়ে যেন চাকা বাঁধা আছে। ... উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছে। ...

তার মা এগিয়ে গিয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল... কাজ ঠিক মতো সম্পন্ন হয়েছে বুঝে চিত্রগ্রীবের বাপ তৃপ্ত মনে স্নান করতে নেমে গেল।

হাতেকলমে

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৩৬) : প্রথম জীবনে সশস্ত্র বিপ্লব-পন্থায় উদবুদ্ধ হয়ে বিদেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের জন্য জাপানে যান। সেখান থেকে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিনদেশে যান। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য বিষয়ে বি.এ. পাশ করেন। তারপরেই লেখালিখির শুরু। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে *Gay Neck* (*চিত্রগ্রীব*) বইটির জন্য *জন নিউবেরি* পদক লাভ করেন। এরপর শিশু সাহিত্যিক হিসেবে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই *Kari: the Elephant, Hari: the Jungle lad, The Chief of the Herd* (*যূথপতি*) প্রভৃতি।

১.১ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কোন বইয়ের চিত্ররূপ তুমি পড়লে?

১.২ তাঁর লেখা অন্য আর একটি বইয়ের নাম লেখো।

২. 'চিত্রগ্রীব' নামক ছবিতে গল্পটি পড়ে চিত্রগ্রীবের বাবা ও মায়ের আচরণ তোমার কেমন লাগল কয়েকটি বাক্যে লেখো। বাবা-মায়ের সাহচর্যে চিত্রগ্রীব যেমন উড়তে শিখেছে, ঠিক তেমন কোন শিক্ষা তুমি প্রথম বাবা-মায়ের সাহচর্যে শিখেছ—মনে করে লেখো।

৩. তোমরা 'চিত্রগ্রীব' নামের পায়রাটির উড়তে শেখার কথা জানলে। তুমি কখনও টিয়া বা চন্দনার মতো এমন কোনো পাখি দেখেছ যারা কথা বলতে পারে? যদি এই ধরনের কোনো পাখির সঙ্গে তোমার ভাব হয়, তাহলে তুমি তার সঙ্গে কী কথা বলবে? তোমাদের সেই কাল্পনিক সংলাপটি সংক্ষেপে লেখো।

৪. 'চিত্রগ্রীব' যেমন একটি ছবিতে গল্প ঠিক এই রকমের একটি ছবিতে গল্প বন্ধুরা মিলে 'কুমোরে-পোকার বাসাবাড়ি' বা 'সেনাপতি শংকর' রচনাংশটি অবলম্বনে তৈরি করে দেখতে পারো।

আশীর্বাদ

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

বর্ষা খুব নেমেছে। নীচেও ডেকেছে বান। জলে দেশ থইথই করছে।

একটি পিঁপড়ে আশ্রয় নিয়েছে একটি ঘাসের পাতার নীচে।

পাতাটা কাঁপছে। হেলে পড়ছে। বৃষ্টির ফোঁটার ঘায়ে পাতাটা বোধহয় এলিয়ে পড়বে জলে। আর একটুকুতেই, পিঁপড়েটা, অসীম জলে ভেসে যাবে-যাবে হয়েছে।

পাতা বললে—‘ভাই, জোরে আঁকড়ে ধরো। কামড়ে ধরো আমাকে; আমার লাগবে না। ভয় পেয়ো না, তোমরা তো সাঁতার জানো, হেঁটে, দৌড়েও চলো, তোমাদের আবার কী?

পাতার শিরা কামড়ে ধ’রে পিঁপড়ে আধ-গলায় বললে—‘দেখো, শরীরটা জলে ডুবে গেল, দাঁড়াও ভাই, বলছি।’

এক ঢোঁক জল খেয়ে পিঁপড়ে আর কিছু বলতে পারলে না। চোখ বুজে পাতাতে দাঁত বসিয়ে, ডুবু-ডুবু হয়ে ঝুলে রইল।

পাতা হাসলে—‘ভাই, ভাগ্যে তুমি জিমনাস্টিকস জানতে। আমরা নড়তেও পারিনে। কোনোরকমে শুঁড়-টুড় বাড়াই। চলতেই জানলেম না, তা, ঝুলব কোথায় গিয়ে?’

বৃষ্টি একটু ধরল। ঘাসের পাতাটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কামড় আর নিশ্বাস ছেড়ে, পিঁপড়ে বললে—‘বাপ! বাঁচলেম ! বলছিলে ভাই, ঠিক। আমরা সাঁতার জানি; হাঁটতে জানি, দৌড়োতেও খুব। দুত্তোর। কাজে আসে না কোনোটাই। ডাঙায় রোদ্দুরের দিনে পুড়ে মরি, বর্ষায় তুমি ছিলে তাই আজ বেঁচে গেলাম—’

—‘ও কথা বলে লজ্জা দিও না।’ হাতে হাত দিয়ে ধরে বললে পাতা। ‘বাঁচন আর মরণ নাকি একটা কথা? তুমি যে কাজের লোক ভাই! ওইটেই আসল।’

শুনে, বর্ষাতেও পিঁপড়ের মুখ শুকিয়ে গেল! ভিজে শরীরে শুকনো মুখে সে বললে—'ভাই, কাজ তো করিই। সারা দিন-রাত খাটি। খাটি। খাটি। শুধু খাই। দাই। থাকি গর্তে। তোমরা পৃথিবীর উপরে হাসো, ফুলটুল ফুটাও। আমরা যাই, আসি, দেখি। ছাই ও-কাজ। শেষে আবার সেই গর্তেই ঢুকি গিয়ে। বুঝি ভাই, মাটি আমাদের, পৃথিবীটা তোমাদের।'

শিউরে পাতা বললে— 'ভাই, অমন কথা বোলো না; মাটি সবারই। থইথই যে জল, মাটি না থাকলে চলত কোথা দিয়ে?'

পিঁপড়েও শিউরোল—'হায় ! এ জল কী করে পার হব?'

বৃষ্টি ঝম-ঝম করে এল। তাড়াতাড়ি পিঁপড়ে আবার কামড়ে ধরলে পাতা।

বৃষ্টি দাঁড়াল। 'ভাই, শুনেছিলাম তোমাদের কথা। মেঘের আড়াল থেকেও শুনেছি। পিঁপড়ে ভাই, বড্ড তোমার ভয়? না? কিন্তু ওই পাতা বন্ধুটিকে আমি কোনোদিন ভয় পেতে দেখিনি। আমরা চলে যাই বিদেশে, ফিরে এসে দেখি, রোদ্দুরে পুড়ে বন্ধুর দল ধুলো হয়ে আছে। যেই দি ডাক, আর, ধুলো ঝেড়ে সারা দেশে সবুজ হয়ে ওঠে সবুজ পাতা চিরদিন। আমি আনন্দে গান গেয়ে উঠি সবুজ বন্ধুর হাত ধরে।'

খল খল করে হেসে উঠল জল, ঢেউ তুলে —'তুমি গান গাচ্ছ, আমিও গাই। বর্ষায় যে ঘাসকে আমি ডুবিয়ে, কাদায় লুটিয়ে, তলিয়ে দিয়ে ছুটি, শরতে চেয়ে দেখি, তারাই কাশবন হয়ে হাসছে!'

ঘাসের পাতা আস্তে মাথা নোয়ালে হাওয়ায়।

পিঁপড়ে জড়িয়ে ধরল পাতার শিরা। বুক ভেঙে নিশ্বাস পড়ল পিঁপড়ের। হায়! পিঁপড়ে আমি চিরদিন পিঁপড়ে হয়েই রইলেম! তবু ছিলেম গর্তে, ছিলেম ডাঙায়। এ জল কি শুকুবে কোনো দিন?

ঘাসের পাতা মাথা নুইয়েই ছিল। এবারে মাথা একটু তুলল। তারপর বললে পিঁপড়ের কানে কানে—'বন্ধু, ভাই, ভয় তুমি পেয়ো না। ভেবো না একটুও। বাদল চলে যাবে, চলে যাবে এ জল নিশ্চয়। আসবে। আসবেই। আসছে শরৎ।'

পৃথিবী তোমার হবে।

পিঁপড়ে চোখ তুললে। আহা, পৃথিবী কি আবার তার হবে! পিঁপড়ের চোখে জল, আসতে আসতে, থামল।

চেয়ে সে দেখলে, মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের চোখও হাসছে।

হবেই। আশীর্বাদ করি, শরতের আশীর্বাদ তোমাদেরও উপরে ঝরুক।

পৃথিবী সবারই হোক।

হাতেকলমে

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭—১৯৫৬) : বাংলাদেশের ঢাকা জেলার উলাইল গ্রামে বিখ্যাত মিত্র মজুমদার বংশে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *উত্থান*। কবিতা দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত রূপকথা, উপকথা ও লোককথার গল্প। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখের গল্পকথাকে সংগ্রহ করে নিজের মতো করে মূল কাহিনিটি লিখতেন। দক্ষিণারঞ্জন ১৯৩০-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত *বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ*-এর সহসভাপতি ছিলেন। তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থগুলির নাম — *ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে, উৎপল ও রবি, কিশোরদের মন, বাংলার সোনার ছেলে, চিরদিনের রূপকথা* ইত্যাদি। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে *বঙ্গীয় শিশু সাহিত্য পরিষদ* তাঁকে *ভুবনেশ্বরী পদক* দিয়ে সম্মানিত করেন।

১.১ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে সবচেয়ে বেশি কী আকর্ষণ করত?

১.২ তিনি শিশুসাহিত্যের কোন পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন?

২. নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ বন্যায় প্রকৃতির রূপ কেমন হয়?

২.২ পিঁপড়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল?

২.৩ বৃষ্টির সময়ে গাছের পাতা কাঁপছিল কেন?

২.৪ পিঁপড়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কী করল?

২.৫ পিঁপড়ে কখন 'বাপ! বাঁচলেম' বলে উঠল?

২.৬ জল কেমন শব্দে হেসে উঠেছিল?

২.৭ 'বুক ভেঙে নিশ্বাস পড়ল পিঁপড়ের।'—কেন এমন হলো?

২.৮ 'শরতের আশীর্বাদ তোমাদেরও উপরে ঝরুক।'— কে এমনটি কামনা করেছিল?

৩. নীচের বাক্যগুলি থেকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া চিহ্নিত করে লেখো:

৩.১ বর্ষা খুব নেমেছে।

৩.২ ভাই, জোরে আঁকড়ে ধরো।

৩.৩ এক ঢোঁক জল খেয়ে পিঁপড়ে আর কিছু বলতে পারলে না।

৩.৪ বৃষ্টির ফোঁটার ঘায়ে পাতাটা বোধ হয় এলিয়ে পড়বে জলে।

৩.৫ শিউরে পাতা বললে— 'ভাই, তেমন কথা বোলো না।'

৪. সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া চিহ্নিত করো :

৪.১ সারা দিন রাত খাটি।

৪.২ আমরা যাই, আসি, দেখি।

৪.৩ ঘাসের পাতাটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪.৪ এ জল কী করে পার হব?

৪.৫ পৃথিবী তোমার হবে।

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করো : নিশ্বাস, বৃষ্টি, নিশ্চয়, আশীর্বাদ।

শব্দার্থ : বান — বন্যা। অসীম — সীমাহীন। জিমনাস্টিক — শরীরচর্চা, ব্যায়াম, শারীরিক কসরৎ। আশীর্বাদ — বর।

৬. নীচের শব্দগুলি থেকে উপসর্গ পৃথক করো এবং তা দিয়ে দুটি নতুন শব্দ তৈরি করো :

বিদেশ, দুর্ভাগ্য, অনাবৃষ্টি, সুদিন, নির্ভয়।

৭. নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে লেখো : আশ্রয়, শরীর, শরৎ, মুখ, ফুল।

৮. 'চোখ' শব্দটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে পৃথক বাক্য রচনা করো।

৯. নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও ঃ

৯.১ আমরা সাঁতার জানি।

৯.২ বর্ষাতেও পিঁপড়ের মুখ শুকিয়ে গেল।

৯.৩ শেষে আবার সেই গর্তেই ঢুকি গিয়ে।

৯.৪ খল্‌খল্ করে হেসে উঠল জল।

৯.৫ পৃথিবী সবারই হোক।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

১০. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :

১০.১ আমরা সাঁতার জানি। আমরা হাঁটতে জানি। ('এবং' দিয়ে বাক্য দুটিকে যুক্ত করো।)

১০.২ তোমরা পৃথিবীর উপরে হাসো, ফুলটুল ফুটাও। (দুটো বাক্যে ভেঙে লেখো।)

১০.৩ বর্ষা খুব নেমেছে। নীচেও ডেকেছে বান। ('যখন-তখন' দিয়ে বাক্য দুটিকে যুক্ত করো।)

১০.৪ আমরা নড়তেও পারি নে। কোনোরকমে শুঁড়-টুড় বাড়াই। ('কিন্তু' অব্যয়টি দিয়ে বাক্য দুটিকে যুক্ত করো।)

১০.৫ এক ঢোঁক জল খেল এবং পিঁপড়ে কিছু বলতে পারলে না। ('এবং' অব্যয়টি তুলে দিয়ে বাক্যদুটিকে একটি বাক্যে লেখো।)

১১. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

১১.১ পাঠ্যাংশে কোন কোন ঋতুর প্রসঙ্গ রয়েছে? প্রতি ক্ষেত্রে একটি করে উদাহরণ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

১১.২ পাতা গাছের কী প্রয়োজনে লাগে?

১১.৩ পিঁপড়ের বাসস্থান সম্পর্কে অনধিক তিনটি বাক্য লেখো।

১১.৪ বৃষ্টি পাতাকে কোন পরিচয়ে পরিচায়িত করেছে?

১১.৫ সবার কথা শুনে পিঁপড়ে কী ভাবল?

১১.৬ প্রকৃতির বুকে শরতের আশীর্বাদ কীভাবে ঝরে পড়ে?

১২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১২.১ বৃষ্টির সময় তোমার চারপাশের প্রকৃতি কেমন রূপ নেয় সে সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখো।

১২.২ পিঁপড়ে গাছের পাতায় আশ্রয় নিয়েছিল কেন?

১২.৩ পাতা কেন পিঁপড়েকে তার শরীর কামড়ে ধরতে বলেছিল?

১২.৪ পাতা কী বলে পিঁপড়েকে প্রবোধ দিতে চেয়েছিল? ‘কাজে আসে না কোনোটাই’— এখানে তার কোন কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে?

১২.৫ ‘তাই আজ বেঁচে গেলাম’— বক্তার ‘আজ’ বেঁচে যাওয়ার কারণ কী?

১২.৬ পিঁপড়ে আর পাতা কীভাবে নিজেদের কষ্টের কথা গল্পে বলেছে তা একটি অনুচ্ছেদে লেখো।

১২.৭ পিঁপড়ের সঙ্গে গাছের কথাবার্তা নিয়ে সংলাপ তৈরি করো। শ্রেণিকক্ষে অভিনয়ের আয়োজন করো।

১২.৮ ‘মাটি সবারই’— পাতার এই কথার মধ্যে দিয়ে কোন সত্য ফুটে উঠেছে?

১২.৯ মেঘের আড়াল থেকে বৃষ্টি কোন কথা শুনতে পেয়েছিল? তা শুনে বৃষ্টি পিঁপড়েকে কী বলল?

১২.১০ শরৎ ঋতুর প্রকৃতি কেমন সে বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

১২.১১ পাতা, বৃষ্টি, জল, ঘাসের পাতা কে কীভাবে পিঁপড়ের মনে সাহস জুগিয়েছিল— তা আলোচনা করো।

এক ভূতুড়ে কাণ্ড

শিবরাম চক্রবর্তী

ভূত বলে কিছু আছে? যদি থাকে তো তিনি আমাকে কখনও দেখা দেননি। তাঁর দয়া, এবং আমার ধন্যবাদ। কৃপা করে দর্শন দিলে আমি তাঁকে দেখতে পারতাম কিনা সন্দেহ। ভূতদের রূপগুণে আমার কোনো মোহ নেই। তাছাড়া আমার হার্ট খুব উইক। আর শুনেছি যে ওরা ভারি উইকেড—

তবে ভূত কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু অদ্ভুত একটা কিছু একবার আমি দেখেছিলাম। দেখেছিলাম রাঁচিতে। না, পাগলা গারদে নয়, তার বাইরে— সরকারি রাস্তায়। রাঁচির রাজপথ না হলেও সেটা বেশ দরাজ পথ। কী করে দেখলাম বলি।

একটা পরস্মৈপদী সাইকেল হাতে পেয়ে হুড্রুর দিকে পাড়ি জমিয়েছিলাম কিন্তু মাইল সাতেক না যেতেই তার একটা টায়ার ফেঁসে গেল। যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়— একটা কথা আছে না? আর যেখানে সন্ধে হয় সেইখানেই সাইকেলের টায়ার ফাঁসে।

জনমানবহীন পথ। জায়গাটাও জংলি। আরও মাইল পাঁচেক যেতে পারলে গাঁয়ের মতো একটা পাওয়া যেত— কিন্তু সাইকেল ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হলেই হয়েছে! এমনকী, সাইকেল ফেলে, শুধু পায়ে হেঁটে যেতেও পারব কিনা আমার সন্দেহ ছিল। হাঁটতে হবে আগে জানলে হাতে পেয়েও সাইকেলে আমি পা দিতাম না নিশ্চয়।

তখনও সন্ধে হয়নি। এই - হব - হব। সামনে গেলে পাঁচ মাইল, ফিরতে হলে সাত—দু দিকেই সমান পাল্লা। কোন দিকে হাঁটন দেবো হাঁ করে ভাবছি। শেষ পর্যন্ত কী হাঁটতেই হবে? এই একই প্রশ্ন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে পুনঃপুনঃ আমার মানসপটে উদিত হয়েছে। আর এর একমাত্র উত্তর আমি দিয়েছি— না বাবা, প্রাণ থাকতে নয়!

অবশ্যি, একরকম স্থানে আর এহেন অবস্থায় প্রাণ বেশিক্ষণ থাকবে কিনা সেটাও প্রশ্নের বিষয় ছিল। সন্ধে উৎরে গিয়ে বাঁকা চাঁদের ফিকে আলো দেখা দিয়েছে। সেদিন পর্যন্ত এধারে বাঘের উপদ্রব শোনা গেছল। কখন হালুম শুনব কে জানে!

তবু, চিরদিনই আমি আশাবাদী। সমস্যার সমাধান কিছু না কিছু একটা ঘটবেই। অচিরেই ঘটল বলে। দু-এক মিনিটের অপেক্ষা কেবল এবং সেই অভাবনীয়ের সুযোগ নিয়ে সহজেই আমি উদ্ধার লাভ করব।

এরকমটা ঘটেই থাকে, এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কত গল্পের বইয়ের এরূপ ঘটতে দেখা গেছে আমার নিজেরই কত গল্পে এরকম দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই আর স্বয়ং লেখক হয়ে আমি নিজে আজ বিপদের মুখে পড়েছি বলে সেই সব অঘটনগুলো ঘটবে না? কোনো গল্পের নায়ক কি কখনও বাঘের পেটে গেছে? তবে একজন গল্পলেখকই বা কোন দুঃখে যাবে শুনি?

সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তের অপেক্ষায় আরও আধ ঘণ্টা কাটালাম। অবশেষে একটা ঘটনার মতো দেখা দিলো বটে। একখানা লরি। খুব জোরেও নয়, আস্তেও নয়, আসতে দেখা গেল সেই পথে। রাঁচির দিকে যাচ্ছিল লরিটা।

আমার টর্চ বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলাম। শীতের রাত, ফিকে চাঁদের আলো, তার ওপর কুয়াশার পর্দা পড়েছে— এই ঘোরালো আবহাওয়ার মধ্যে আমার আলোর ঘূর্ণিপাক লরির ড্রাইভার দেখতে পেলে হয়।

লরিটা এসে পৌঁছল—এল একেবারে সামনাসামনি, মুহূর্তের জন্যই এল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও থামল না। যেমন এল তেমনি চলে গেল নিজের আবেগে। রাস্তার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। অনর্থক কেবল টর্চটাকে আর নিজেকে টর্চার করা। আলোর আন্দোলন করতে গিয়ে হাত ব্যথা হয়ে গেছল। ছ্যা ছ্যা! শেষটা কি হাঁটাই আছে কপালে? এই ঝাপসা আলো আর কুয়াশার মধ্যে সাইকেল টেনে পাক্কা সাত মাইলের ধাক্কা। — ভাবতেই আমার বুকটা দুর দুর করতে থাকে। তারচেয়ে বাঘের পেটের মধ্যে দিয়ে স্বর্গে যাওয়া ঢের শর্টকাট।

না-না! কোথাও যেতে হবে না— বাঘের পেটেও নয়। কিছু না কিছু একটা হতে বাধ্য — অনতিবিলম্বেই হচ্ছে! আর এক মিনিটের অপেক্ষা কেবল!

এর মধ্যে কুয়াশা আরো জমেছে, চাঁদের আলো ফিকে হয়ে এসেছে আরো। আমি নিজেকে প্রাণপণে প্রবোধ দিচ্ছি, এমন সময়ে দুটো হলদে রঙের চোখ কুয়াশা ভেদ করে আসতে দেখা গেল। বাঘ নাকি? ... না, বাঘ নয় — দুই চোখের অতখানি ফারাক থেকেই বোঝা যায়। বাঘের দৃষ্টিভঙ্গি ওরকম উদার হতে

পারে না। আবার আমি বাহুবলে টর্চ ঘোরাতে লাগলাম। ছোট্ট একটা বেবি অস্টিন — তারই কটাক্ষ! আস্তে আস্তে আসছিল গাড়িটা — এত আস্তে যে মানুষ পা চালালে বোধ হয় ওর চেয়ে জোর চলতে পারে।

আসতে আসতে গাড়িটা আমার সামনে এসে পড়ল। আমি হাঁকলাম — এই।

কিন্তু গাড়িটার থামবার কোনো লক্ষণ নেই! তেমনি মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলতে লাগল গাড়িটা। আমার পাশ কাটিয়ে যাবার দুর্লক্ষণ দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

না, আর দেরি করা চলে না, এক্ষুনি একটা কিছু করে ফেলা চাই। এসপার ওসপার যা হোক! গাড়ি মালিকের না হয় ভদ্রতা রক্ষা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাকে তো আত্মরক্ষা করতে হবে!

অগত্যা, আগায়মান গাড়ির গায়ে গিয়ে পড়লাম। দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। চলন্ত গাড়িতে ওঠা সহজ নয়, নিরাপদও না; কিন্তু কী করব, এক মিনিটও সময় নষ্ট করার ছিল না। কায়দা করে উঠতে হলো কোনোগতিকে। কে জানে, এই হয়ত সশরীরে বাঁচি ফেরার শেষ সুযোগ!

সাইকেলটা রাস্তার ধারে ধরাশায়ী হয়ে থাকল। থাকগে, কী করা যাবে? নিতান্তই যদি রাত্রে বাঘের পেটে না যাই, — (বাঘেরা কি সাইকেল খেতে ভালোবাসে?) কাল সকালে উদ্ধার করা যাবে। সাইকেলের মালিককে আগামীকাল এক সময়ে জানালেই হবে — বেশি বলতে হবে না — খবর দেওয়া মাত্র তিনি নিজেই এসে নিয়ে যাবেন।

ছোট্ট গাড়ির মধ্যে যতটা আরাম করে বসা যায় বসেছি! বসে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলতে গেছি — ‘ আমায় লালপুরার মোড়টায় নামিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে। ডাক্তার যদুগোপালের বাড়ির — ’

বলতে বলতে আমার গলার স্বর উবে গেল, বক্তব্যের বাকিটা উচ্চারিত হলো না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম— আমার দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। আমার শার্টের কলারটা মনে হলো যেন আমার গলার চারধারে চেপে বসেছে। হাত তুলে যে গলার কাছটা আলগা করব সে ক্ষমতা নেই। আঙুলগুলো অব্দি অবশ। সেই শীতের রাত্রেও সারা গায়ে আমার ঘাম দিয়েছে। যেখানটায় ড্রাইভার থাকবার কথা সেখানে কেউ নেই। একদম ফাঁকা, আমি তাকিয়ে দেখলাম। জিভ আমার টাকরায় আটকে ছিল। কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে নামলে বাক্‌শক্তি ফিরে পেলাম। ‘ভূত! ভূত ছাড়া কিছু না!’ আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার কথায় ভূত যে কর্ণপাত করল তা মনে হলো না। বে-ড্রাইভার গাড়ি যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

কিন্তু তাহলেও এমন অভূতপূর্ব অবস্থায় আমায় পড়তে হবে ভাবিনি।

ড্রাইভার নেই, এবং গাড়ির ইঞ্জিনও চলছিল না। তবু গাড়ি চলছিল এবং ঠিক পথ ধরেই চলছিল। এইকথা ভেবে, এবং হেঁটে যাওয়ার চেয়ে বসে যাওয়ায় আরাম বেশি বিবেচনা করে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে সেই ভূতুড়ে গাড়িকেই আশ্রয় করে রইলাম। আলস্যের সঙ্গে আমি কোনোদিনই পারি না; চেষ্টা করলে হয়ত বা কায়ক্লেশে পারা যায়; কিন্তু পেরে লাভ? লাভ তো ডিমের! চিরকালের মতো এবারও

আমার আলস্যই জয়ী হলো শেষটায়। ঘণ্টা দুয়েক পরে গাড়িটা একটা লেভেল-ক্রসিংয়ের মুখে পৌঁছেছে। ক্রসিংএর গেট পেরিয়ে যখন প্রায় লাইনের সম্মুখে এসে পড়েছি তখন হুঁশ হলো আমার। হুস হুস করে তেড়ে আসছিল একটা আওয়াজ! রেলগাড়ির আগমনী কানে আসতেই আমি চমকে উঠলাম। আপ কিংবা ডাউন — একটা গাড়ি এসে পড়ল বলে — অদূরে তার ইঞ্জিনের আলো দেখা দিয়েছে— কিন্তু আমার গাড়ির থামবার কোনো উৎসাহ নেই! ... বিনে ভাড়ায় গাড়ি চেপে চলেছি বলে কি অদৃশ্য ভূত আমায় টেনে নিজের দল ভারী করতে চায় নাকি? নিঃশব্দ রাত্রির শান্তিভঙ্গ করে গমগম করতে করতে ছুটে আসছিল ট্রেনটা। তার জ্বলন্ত চোখে মৃত্যুদূতের হাতছানি!

আমার গাড়ির হাতলটা কোথায়? — এক্ষুনি নেমে পড়া দরকার — আরেক মুহূর্ত দেরি হলেই হয়েছে।

কোনো রকমে দরজা খুলে তো বেরিয়েছি। আমিও নেমেছি আর আমার গাড়িও থেমেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে দিয়ে রেলগাড়িটাও গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার সম্বিত ছিল না। হুস হুস করে ট্রেনটা চলে যাবার পর আমার হুঁশ হলো।

নাঃ মারা যাইনি — হুঁশিয়ার হয়ে দেখলাম। জলজ্যান্ত রয়েছি এখনও এবং মোটরগাড়িটাও চুরমার হয়নি। আমার পাশেই ছবির মতন দাঁড়িয়ে —

আমার এবং মোটরটার টিকে থাকা একটা চূড়ান্ত রহস্য মনে হচ্ছে — এমন সময় চোখে চশমা-লাগান একটা লোক বেরিয়ে এল মোটরের পেছন থেকে।

'আমাকে একটু সাহায্য করবেন?' এগিয়ে এসে বললেন ভদ্রলোক — 'দয়া করে যদি আমার গাড়িটা একটু ঠেলে দ্যান মশাই। আট মাইল দূরে গাড়িটার কল বিগড়েছে, সেখান থেকে একলাই এটাকে ঠেলতে ঠেলতে আসছি! সারা পথে একজনকেও পেলাম না যে আমার সঙ্গে হাত লাগায়। যদি একটু আমার সঙ্গে হাত লাগান। লাইনটা পেরিয়েই আমার বাড়ি, একটু গেলেই। ওই যে, দেখা যাচ্ছে — আর এক মিনিটের রাস্তা।'

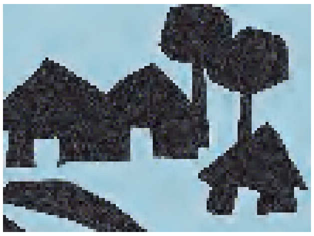

হাতেকলমে

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) : পোশাকি নাম চঞ্চল। লেখার ক্ষেত্রে শিবরাম নামেই পরিচিত। বাংলা রম্যরচনা ও মজার গল্পে তিনি অগ্রগণ্য। *বাড়ি থেকে পালিয়ে, হাসির টেক্কা, হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন, মস্কো বনাম পন্ডিচেরি, ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা* তাঁর বিখ্যাত বই।

১.১ শিবরাম চক্রবর্তীর পোশাকি নাম কী?

১.২ তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের বাক্যগুলি কী ধরনের (সরল/যৌগিক/জটিল) তা নির্দেশ করো:**

২.১ ভূত বলে কিছু আছে?

২.২ যেখানে সন্ধে হয় সেইখানেই সাইকেলের টায়ার ফাঁসে।

২.৩ একটা পরস্মৈপদী সাইকেল হাতে পেয়ে হুড্ডুর দিকে পাড়ি জমিয়েছিলাম কিন্তু মাইল সাতেক না যেতে যেতেই তার একটা টায়ার ফেঁসে গেল।

২.৪ আমার টর্চবাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলাম।

২.৫ যেখানটায় ড্রাইভার থাকবার কথা সেখানে কেউ নেই।

৩. **নীচের বাক্যগুলিতে কী কী অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে লেখো :**

৩.১ সাইকেল ঘাড়ে করে যেতে হলেই হয়েছে !

৩.২ কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে নামলাম।

৩.৩ তার চেয়ে বাঘের পেটের মধ্যে দিয়ে স্বর্গে যাওয়া ঢের শর্টকাট।

৩.৪ আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়েই বেরিয়ে গেল।

৪. **নীচের বাক্যগুলিকে কর্তাখণ্ড ও ক্রিয়াখণ্ডে ভাগ করো :**

৪.১ আসতে আসতে গাড়িটা আমার সামনে এসে পড়ল।

৪.২ দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

৪.৩ চিরদিনই আমি আশাবাদী।

৪.৪ এগিয়ে এস বললেন ভদ্রলোক।

৫. **নীচের বাক্যগুলির মধ্যে থেকে সন্ধিবন্ধ শব্দ বেছে নিয়ে সন্ধিবিচ্ছেদ করো :**

৫.১ কিন্তু গাড়িটার থামবার কোনো লক্ষণ নেই!

৫.২ আমার পাশ কাটিয়ে যাবার দুর্লক্ষণ দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

৫.৩ শেষপর্যন্ত আস্তে আস্তে আসছিল গাড়িটা।

৫.৪ কাল সকালে উদ্ধার করা যাবে।

শব্দার্থ : দরাজ — ব্যাপ্ত। পরস্মৈপদী — এখানে 'অন্যের' বোঝানো হয়েছে। পাল্লা — তুলনা, প্রতিযোগিতা। মানসপটে — মনের মধ্যে। অবশ্যম্ভাবী — যা নিশ্চয় হবে। বেবি অস্টিন — অস্টিন কোম্পানির ছোটো গাড়ি। উইকেড — দুষ্টু ও ক্ষতিকর।

৬. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৬.১ 'সাইকেল ঘাড়ে করে যেতে হলেই হয়েছে!' — লেখকের গন্তব্য কোথায়? সাইকেল ঘাড়ে করে যাওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে কেন?

৬.২ 'যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়' — প্রবাদটির মর্মার্থ কী? একই ভাব বোঝাতে তুমি আরেকটি প্রবাদ উল্লেখ করো।

৬.৩ 'চিরদিনই আমি আশাবাদী' — এই আশাবাদের গুণে লেখক কীভাবে পুরস্কৃত হলেন?

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৭.১ 'অনর্থক কেবল টর্চটাকে আর নিজেকে টর্চার করা' — কোন ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিটির অবতারণা? 'টর্চ' আর 'টর্চার' শব্দের প্রয়োগে যে শব্দ নিয়ে খেলা তৈরি হয়েছে, গল্প থেকে খুঁজে এমন কয়েকটি উদাহরণ দাও। তুমি নিজে এ জাতীয় কয়েকটি বাক্য লেখো।

৭.২ গল্প অনুসরণে সেই নির্জন বনপথে লেখকের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

৭.৩ 'বাঘের দৃষ্টিভঙ্গি ওরকম উদার হতে পারে না।' — কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছে? লেখকের কাছে সেই 'দৃষ্টিভঙ্গি' কতটা উদারতা নিয়ে এসেছিল, তা বুঝিয়ে দাও।

৭.৪ 'এই হয়ত সশরীরে রাঁচি ফেরার শেষ সুযোগ।' — কোন সুযোগের কথা বলা হয়েছে? লেখক কীভাবে সেই সুযোগকে কাজে লাগালেন?

৭.৫ 'আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম' — লেখক কেন তার কথা অসমাপ্ত রেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন?

৭.৬ 'বে-ড্রাইভার গাড়ি যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল' — 'বে-ড্রাইভার গাড়ি' চলার প্রকৃত কারণটি কীভাবে গল্পে উন্মোচিত হলো?

৭.৭ 'এবারও আমার আলস্যই জয়ী হলো শেষটায়।' — গল্প অনুসরণে লেখকের উৎকণ্ঠা, আলস্য ও কর্মতৎপরতার দৃষ্টান্ত দাও।

৭.৮ শেষ পর্যন্ত লেখক সেই 'বেবি অস্টিন' থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন কেন? এরপরে তিনি কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন?

৮. **তোমার কোনো গা-ছমছমে অভিজ্ঞতার কথা বন্ধুর কাছে একটি চিঠিতে লেখো।**

বাঘ !

নবনীতা দেবসেন

এক যে ছিল ছোট্ট হলুদ বাঘ
তাদের পাখিরালয় বাসা।
তার মনে মনে জমছে কেবল রাগ —
কেন, বনটা কেবল পাখি দিয়েই ঠাসা?

মা-বাবা তার বেছেছেন এই বন
নেই যেখানে ছাগল হরিণ ভেড়া;
ধরবে বা কী? খাবেই বা কী? কোন
ভদ্র বাঘে হেথায় বাঁধে ডেরা?

বাঘছানা কি ধরতে পারে পাখি?
যতই বাড়াক সব্বোনেশে থাবা
পাখির সঙ্গে পেরে উঠবে নাকি?
এক মিনিটেই আকাশপথে হাওয়া!

ছোট্ট বাঘের ছোট্ট শরীর যত
লাফিয়ে ওঠে, ধরতে পাখির ছানা,
পাখিরা সব কিচমিচিয়ে তত
উড়ে পালায় ছড়িয়ে দিয়ে ডানা।

ছোট্ট বাঘের বড্ড খিদে পেটে।
কী আর করে, গেল নদীর পাড়ে।
লালঠেঙো সব কাঁকড়া বেড়ায় হেঁটে,
লম্বা থাবায় ধরতে যদি পারে।

বাঘের ছানা জানত না তো মোটে
কাঁকড়া কেমন চিমটে ধরে দাঁড়া-য়
গর্তে থাবা দিয়েই কেঁদে ওঠে—
'ওরে ব্বাবা! কে আমাকে ছাড়ায়?'

ছোট্ট বাঘের মস্ত হলুদ বাবা
কান্না শুনে দৌড়ে এলেন ঘাটে,
বাড়িয়ে দিলেন গোবদা নখের থাবা
এক থাবড়ায় কাঁকড়া-দাঁড়া কাটে।

খিদের পেটে বাঘের ছানা যখন
ধরতে গেল কাদায় মেনিমৎস্য—
বাঘজননী লজ্জা পেলেন তখন
—'ভোঁদড় তো নোস, ব্যাঘ্র যে তুই, বৎস!'

ছানার দুঃখে দুঃখু পেয়ে ভারি
বাঘ বাবা-মা বদলে নিলেন বাড়ি
সেই থেকে বাঘ যায় না পাখিরালয়
সবাই মিলে থাকে সজনেখোলায়।

হাতে কলমে

নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮) : কবি নরেন্দ্র দেব এবং সুলেখিকা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সন্তান। কবিতা, গদ্য, ভ্রমণকাহিনি—সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই *প্রথম প্রত্যয়*। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে—*আমি অনুপম*, *নটী নবনীতা*, *খগেনবাবুর পৃথিবী*, *গল্পগুজব*, *মঁসিয়ে হুলোর হলিডে*, *সমুদ্রের সন্ন্যাসিনী*, *ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহনে*, *হে পূর্ণ তব চরণের কাছে*, *নব-নীতা*, প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি *সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার* এবং শিশু সাহিত্যে *বিদ্যাসাগর পুরস্কার* পেয়েছেন।

১.১ নবনীতা দেবসেনের প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম কী?

১.২ তাঁর লেখা একটি ভ্রমণকাহিনির নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ পাখিরালয়ের বাসায় কী পাওয়া যেত না?

২.২ ছোট্ট বাঘ তার খিদে মেটানোর জন্য প্রথমে কী ধরতে গিয়েছিল?

২.৩ ছোট্ট বাঘের বাবা-মা বাসা বদলে কোথায় গিয়েছিল?

২.৪ সুন্দরবনের বাঘ কী নামে পরিচিত?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ 'ভদ্র বাঘে হেথায় বাঁধে ডেরা' — বাঘছানার এমন মনে হয়েছিল কেন?

৩.২ ছোট্ট বাঘ পাখির ছানা ধরতে পারেনি কেন?

৩.৩ বাঘের ছানা গর্তে থাবা দিয়েই কেঁদে উঠেছিল কেন?

৩.৪ বাঘছানাকে বাবা কীভাবে কাঁকড়ার হাত থেকে রক্ষা করল?

৩.৫ বাঘজননী লজ্জা পেয়েছিল কেন?

৪. **উদাহরণ দেখে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো :**

ব্যাঘ্র > বাঘ	> মাছ	বৎস >

৫. **সন্ধি করো :**

পাখির + আলয় = ________ কাঁদ্ + না = ________

শব্দার্থ : পাখিরালয় — পাখিদের অভয়ারণ্য। ডেরা — আস্তানা। লালঠেঙো — লাল রং -এর পা বিশিষ্ট। দাঁড়া — দাঁতযুক্ত লম্বা ঠ্যাং।

৬. সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ লেখো :

বন —	পাড়ে —	বাড়ি —
বোন —	পারে —	বারি —

৭. নীচের শব্দগুলির কোনটি বিশেষ্য ও কোনটি বিশেষণ খুঁজে বার করে আলাদা দুটি স্তম্ভে লেখো। এরপর বিশেষ্যগুলির বিশেষণের রূপ এবং বিশেষণগুলির বিশেষ্যের রূপ লেখো :

মন , শরীর , সব্বোনেশে , ভদ্র , এক , পেট , রাগ।

৮. নিম্নরেখ পদগুলির বিভক্তি অংশ আলাদা করে দেখাও :

৮.১ ভদ্র বাঘে হেথায় বাঁধে ডেরা।

৮.২ পাখির সঙ্গে পেরে উঠবে নাকি?

৮.৩ ছোট্ট বাঘের মস্ত হলুদ বাবা।

৯. নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও :

৯.১ তার মনে মনে জমছে কেবল রাগ।

৯.২ বাঘছানা কি ধরতে পারে পাখি?

৯.৩ লালঠেঙো সব কাঁকড়া বেড়ায় হেঁটে।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

১০. নিজের ভাষায় উত্তর দাও :

১০.১ কবিতাটিতে দেখলাম কাঁকড়ার দাঁড়া থাকে, তোমার দেখা আর যে প্রাণীর দাঁড়া আছে তার সম্পর্কে দু-একটি বাক্য লেখো।

১০.২ ছোট্ট বাঘ ও তার বাবা মা পাখিরালয়ে খাবারের অভাব থাকায় সজনেখালি চলে গিয়েছিল। সারা পৃথিবীতেই আজ মানুষ বন কেটে ফেলায়, নির্বিচারে প্রাণীদের মেরে ফেলায় শুধু বাঘ নয় সমস্ত প্রাণীদেরই খাবারের অভাব তৈরি হচ্ছে। কীভাবে এগুলো বন্ধ করে সমস্ত প্রাণীদের ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়, এ সম্পর্কে তোমার মতামত জানিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

বঙ্গ আমার ! জননী আমার !

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার ! জননী আমার ! ধাত্রী আমার ! আমার দেশ !
কেন-গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন-গো মা তোর রুক্ষ কেশ ?
কেন-গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন-গো মা তোর মলিন বেশ ?
ত্রিংশ কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে— 'আমার দেশ'

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর;

অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ,
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননী, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ!

একদা যাহার বিজয়-সেনানি হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়;
সন্তান যার তিব্বত-চিন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ!

উঠিল যেখানে মুরজ-মন্ত্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চন্ডীদাস যেথা গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই তো মা সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর,
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য; মানুষ আমরা; নহি তো মেষ!
দেবী আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।
ত্রিংশ কোটি মিলিত-কণ্ঠে ডাকে যখন— 'আমার দেশ।'

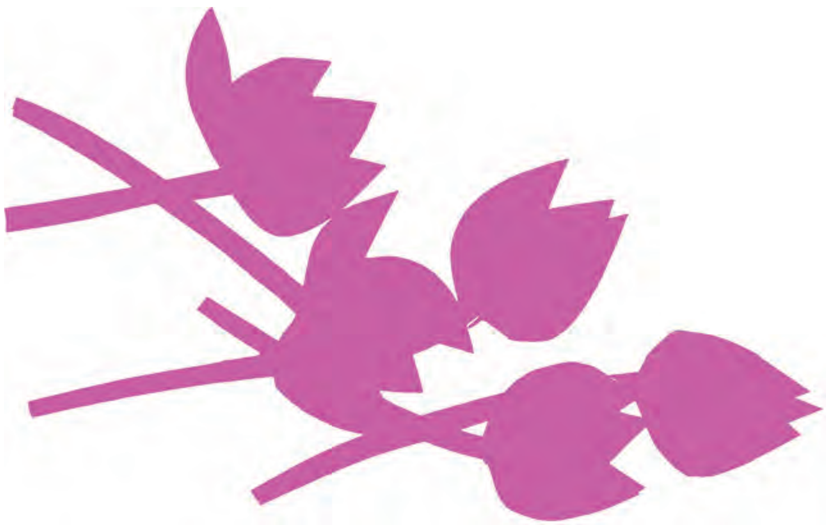

হাতে কলমে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩ -১৯১৩) — বাংলা সাহিত্যের নামকরা নাট্যকার হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পরিচয় কবি হিসাবে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আর্য্যগাথা* (১ম ভাগ)। কবি রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো— *আর্য্যগাথা* (২য় ভাগ), *মন্দ্র*, *আষাঢ়ে*, *আলেখ্য*, *ত্রিবেণী* ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি প্রতিভার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তিনি মানুষের মুখের ভাষাকে ছন্দে প্রয়োগ করেছেন। তিনি অনেক হাসির কবিতা রচনা করেছেন। 'দ্বিজেন্দ্রগীতি' হিসেবে পরিচিত তাঁর গানগুলি আজও বাঙালিজীবনে সমাদৃত। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার মূল সুর ছিল স্বদেশপ্রেম।

১.১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

১.২ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার মূল সুর কী ছিল?

২. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

মলিন, মধুর, আসন, দৈন্য, প্রণত

৩. **নীচে কতগুলি উপসর্গযুক্ত শব্দ দেওয়া হলো। শব্দগুলি থেকে উপসর্গ আলাদা করে দেখাও:**

উপনিবেশ, অশোক, আলোক, প্রণত।

৪. **নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও :**

৪.১ কেন গো মা তোর মলিন বেশ?

৪.২ অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ।

৪.৩ একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।

৪.৪ ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি।

৪.৫ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

৫. **নীচের বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দগুলি নির্দেশমতো লেখো :**

(উদাহরণ : মা + নিমিত্ত + একবচন = মায়ের জন্য)

৫.১ আমি + সম্বন্ধপদ + বহুবচন = ——————

৫.২ —————— + কর্তৃকারক + বহুবচন = আমরা

৫.৩ —————— + সম্বন্ধপদ + একবচন = তোর

৫.৪ যিনি + সম্বন্ধপদ + একবচন = ——————

শব্দার্থ : ধাত্রী — ধারণকারিণী। ত্রিংশ — ৩০ সংখ্যক। মোক্ষ — মুক্তি, নির্বাণ। ছাইল — আচ্ছাদন করা। গান্ধার — (কান্দাহারের প্রাচীন নাম), স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর 'গা', সংগীতের রাগ বিশেষ। সেনানি — সেনাপতি, সৈন্যদল। অর্ণব পোত — সমুদ্রগামী জাহাজ। ছিন্ন — ছিঁড়ে গেছে এমন। মুরজ — বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। গরিমা — গৌরব, মাহাত্ম্য। ভাতিবে — প্রকাশিত হবে, দীপ্তি পাবে। দৈন্য — অভাব। ক্লেশ —কষ্ট, যন্ত্রণা।

৬. **একইরকম অর্থযুক্ত শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :** গৌরব , সুর , মুক্তি , নতুন , জলধি।

৭. **নিম্নলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিটি স্থান সম্পর্কে দু-চারটি বাক্য লেখো :**
বুদ্ধ, রঘুমণি, নিমাই, চন্ডীদাস।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৮.১ কবি দেশকে কী কী নামে সম্বোধন করেছেন?

৮.২ 'কেন গো মা তোর মলিন বেশ'—'মা' বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন? তাকে 'মা' বলা হয়েছে কেন?

৮.৩ 'মা'-এর বেশ মলিন ও কেশ রুক্ষ কেন?

৮.৪ অশোক কোথায় কোথায় তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন?

৮.৫ 'অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর' — 'অর্ধ-জগৎ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? কার চরণে তা প্রণত হয়েছে?

৮.৭ 'যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য'— প্রতাপাদিত্য কে ছিলেন? তিনি কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন?

৮.৮ 'ধন্য আমরা'— 'আমরা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? আমরা কখন নিজেদের ধন্য বলে মনে করতে পারি?

৮.৯ নবীন গরিমা কীভাবে ললাটে ফুটে উঠবে?

৮.১০ আমরা কীভাবে বঙ্গজননীর দুঃখ, দৈন্য, লজ্জা দূর করতে পারি?

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর দাও :**

৯.১ 'যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর'— কবির কেন মনে হয়েছে যে বঙ্গ জননীকে আঁধার ঘিরে আছে?

৯.২ এই বঙ্গভূমি তোমার কাছে কেন প্রিয় সে সম্পর্কে জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

৯.৩ চীন, জাপান, তিব্বতে বাঙালি সত্যি কি কোনোদিন উপনিবেশ তৈরি করেছিল? শিক্ষক / শিক্ষিকার কাছ থেকে এ বিষয়ে জেনে নিয়ে লেখো।

৯.৪ পরাধীন ভারতের মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে এই কবিতায় দেশের প্রতি যে ভাবাবেগ প্রকাশিত হয়েছে তা তোমার নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

শহিদ যতীন্দ্রনাথ দাশ

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

যতীন দাশের জন্ম হয়েছিল ১৯০৪ সালের ২৭ অক্টোবর উত্তর কলকাতার শিকদার বাগান অঞ্চলে মামার বাড়িতে। তাঁরা সব মিলিয়ে দশ ভাই-বোন ছিলেন। পিতামহ মহেন্দ্রনাথ দাশ জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাশ স্বদেশি আন্দোলনের সময় ইংরেজের গোলামি করবেন না বলে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থায়ী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে একটা স্টেশনারি দোকান খুলে সংসার চালাতে গিয়ে আজীবন দারিদ্র্য ও দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। ১৯০১ সালের দশহরার দিনে বঙ্কিমবাবু সপরিবারে গঙ্গাস্নান করে একটা ফিটন গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে (রেড রোডে) কয়েকটি ব্রিটিশ টমি তাঁদের জোর করে ওই গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজেরা গাড়িটি চেপে চলে যায়। বঙ্কিমবাবুকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হলো। ওই দিনই উনি শপথ নেন সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেবেন।

১৯২১ সালে যতীন ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে আই. এ. পরীক্ষাতেও প্রথম ডিভিশন পান। তারপর ১৯২৩ সালে বঙ্গবাসী কলেজের থার্ড ইয়ার বি. এ. ক্লাসে ভরতি হয়ে যান। ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে অংশ নিয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর এমনি ভোজনবিলাসী মানুষ ছিলেন যে পকেটে পয়সা থাকলে বন্ধুদের নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকতেন। ভাবলে অবাক হতে হয় যে এমন এক ভোজনবিলাসী মানুষকেও মিরজাফরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমরণ অনশনের পথই বেছে নিতে হয়েছিল কোন মন্ত্রবলে? তা হলো 'দেশপ্রেম' যা বিপ্লবীকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে দেয় না যে, 'সবার আগে দেশের স্বাধীনতা — তারপর অন্য কথা।'

কিশোর বিপ্লবী হিসেবেই যতীন্দ্রনাথ দাশের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১৯-২০ সালে মাত্র ১৫-১৬ বছর বয়সে একটা বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। বিচারে তাঁর ছয় মাসের জেল হয়। কিন্তু জেলে তাঁকে অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে দেওয়ায় কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। শেষপর্যন্ত ডাক্তারের নির্দেশে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় দেবেন বসু নামে এক দক্ষ বিপ্লবীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয় । দেবেন বসুই শচীন সান্যালের সঙ্গে যতীন দাশের ঘনিষ্ঠতা করে দেন। এই সময় যতীনের ছদ্মনাম হয় — 'রবিন'। আর কিছু দিন গেলে যতীন দাশ আর একটু সিনিয়র হলে তাঁর দ্বিতীয় ছদ্মনাম হয় 'কালীবাবু'। শচীন সান্যাল সিনিয়র ও জুনিয়ার সব বিপ্লবীদের নিয়ে বোমা বানানোর ট্রেনিং ক্লাস শুরু করেন। তাতে যতীন সবচেয়ে সফল ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন।

১৯২৪ সালে শচীন সান্যাল ভারতের সব প্রান্তের বিপ্লবীদের এক ছাতার তলায় আনার জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যার নাম দেন — Hindusthan Socialist Republican Association (প্রথমে নাম ছিল Army, পরে বদল করে নাম করা হয় Association)। তাছাড়া প্রয়োজনীয় পিস্তলের সমস্যা মেটাতে খিদিরপুরের ডক অঞ্চলে যতীনের সক্রিয়তায় এবং বিপ্লবী হরিনারায়ণ চন্দ্র, দেওঘরের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজেন লাহিড়ি, পাঞ্জাবের ইন্দার সিং নারায়ণ ইত্যাদি উগ্রবাদী বন্ধুদের সহায়তায় একটি পিস্তল ও বোমার গোপন দোকান গড়ে ওঠে।

দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতিপাড়ায় যতীন বোমা তৈরির উন্নত প্রণালী শেখাতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও ট্রেনিং দিতেন। ১৯২৫ সালের ১০ নভেম্বর পুলিশ দক্ষিণেশ্বরের বাড়িটি ঘিরে ফেলে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ওই সময় বাড়িতে না থাকায় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে না। ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর পুলিশ গিরীশ মুখার্জি রোডের বাড়ি থেকে তাঁকে (যতীন্দ্রনাথকে) গ্রেফতার করে। একটা মজার ব্যাপার হলো সাক্ষীরা কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি। তবুও ব্রিটিশ শাসকরা Bengal Ordinance প্রয়োগ করে তাঁকে আটক করে রাখে। মেদিনীপুরের এক Condemned Cell-এ তাঁকে রাখা হয়। ওই সময় তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। তখন জেল-ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে ময়মনসিং জেলে পাঠানো হয়। এখানে স্বদেশি বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলতে দেখে তিনি জেল-সুপারের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করে দেন। অবশেষে গোয়েন্দা বিভাগের D.I.G লোম্যানের হস্তক্ষেপে একুশ দিনের দিন অনশন ভঙ্গ

হয়। তারপরই তাঁকে পাঞ্জাবের মরু-অঞ্চলের দুর্গম ও ভয়াবহ মিয়ানওয়ালি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে যতীন্দ্রনাথকে কলকাতায় এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠিক ওই সময়েই তাঁর একমাত্র ভগিনী লাবণ্যপ্রভা দেবীরও মৃত্যু হয়।

১৯২২-২৫ এই সময়টায় জাতীয় কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় আর ঠিক এই সময় সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। আবার ওই সময়েই যতীন দাশ শৃঙ্খলাপরায়ণ কর্মী ও মানুষ হিসেবে সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। প্রত্যেককে সামরিক পদ্ধতিতে ড্রিল, মার্চপাস্ট, অভিবাদন ইত্যাদি করানো হতো। আর এই ব্যাপারে যতীন দাশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়াও তিনি সে সময়ে South Calcutta National School -এর অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ছাত্রদের ড্রিল (Drill) শেখাতেন। কথাগুলি সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যতীন দাশ সম্পর্কে লিখে গেছেন তাঁর *Indian Struggle* বইটিতে।

১৯২৮ থেকে অর্থাৎ সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মত পার্থক্য দেখা যায়। জাতীয় ঐক্য বজায় রেখে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী সদস্যদের অবস্থান শক্ত করতে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরু Indian Independence League বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যতীন দাশ সুভাষচন্দ্রের পথই শ্রেষ্ঠ পথ বিবেচনা করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘকেই সমর্থন জানান।

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মত পার্থক্যের জন্য ভগৎ সিং, ভগবতীচরণ শুক্লা এবং আরও কয়েকজন কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করেন। এই সময় ভগৎ সিং পাঞ্জাবে হিন্দ নওজোয়ান সভা নামে একটি বিপ্লবী দল

প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের ফল হিসেবেই পুলিশি নির্যাতন ও লাঠিচার্জ ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। ফলে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় নিহত হন। পাঞ্জাব কেশরীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ভগৎ সিং পাঞ্জাবের পুলিশ প্রধান মি. স্কটের সহকারী মি. সন্ডার্সকে হত্যা করে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। কলকাতায় এসে দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলে মেস খুঁজে বের করে যতীন দাশের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর তাঁকে (যতীনকে) অনুরোধ করেন ভগৎ সিং-এর নওজোয়ান সভার জন্য যেন কিছু করেন। ভগৎ সিং-এর কথায় ও আগ্রহে খুশি হয়ে যতীন দাশ বলেন — 'বিপ্লবের ক্ষেত্রে আমার যা করণীয় ও দেওয়ার তা আমি উজাড় করে দিয়েছি স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের পায়ে। তবে তোমার মতো মহান বিপ্লবীর জন্যও একটা কাজ আমায় অবশ্যই করতে হবে। তা হলো আগ্রায় গিয়ে তোমার দলের ছেলেদেরও বোমা বানানোতে অত্যন্ত দক্ষ করে দিয়ে আসতে হবে।' কথাবার্তায় দুজনেই বেশ খুশি হন এবং সে রাত্রে ভগৎ সিং যতীন দাশের দক্ষিণ কলকাতার মেসে রাত্রিবাস করেন। এর কিছু দিন পরে যতীন দাশ আগ্রায় গিয়ে ভগৎ সিং-এর দলের ছেলেদের বোমা বানানোর কাজে ভালোরকম ট্রেনিং দিয়ে এসেছিলেন।

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সভ্যদের আসনের পাশেই হঠাৎ একটি শক্তিশালী বোমা ফাটান ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। বিচারে তাঁরা দুজনেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু এই ঘটনার পিছনে ভারতব্যাপী এক বিশাল পরিকল্পনা আছে সন্দেহ করে তদানীন্তন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মি. প্যাট্রি (Mr. Pattry) নিজে পুনরায় তদন্ত শুরু করেন। এর ফলে ত্রিশটি নামের একটি তালিকা বেরিয়ে আসে। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন যতীন দাশ। কালবিলম্ব না করে Lahore Conspiracy Case-এর অন্যতম অভিযুক্ত আসামি হিসেবে কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথ থেকে যতীন দাশকে গ্রেফতার করা হয় ১৪ জুন, ১৯২৯ তারিখে।

২৫ জুন তারিখে যতীন ও তাঁর ১৫ জন সহযোদ্ধাকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হয়। ওই সহযোদ্ধাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন — অজয়কুমার ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, কৃষ্ণকুমার, রাজগুরু প্রমুখেরা। বটুকেশ্বর দত্তকে আগেই লাহোর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে ভগৎ সিংকেও লাহোর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয় পয়লা জুলাই ১৯২৯ সালে।

ঠিক পরের দিনই দোসরা জুলাই যতীন গোপনে বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, এখানে তাঁদের ওপর যে অমানুষিক পুলিশি নির্যাতন চলছে তার প্রতিবাদে তাঁরা ১৬ জন সমবেতভাবে অনশন (Group Hunger Strike) শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শোনামাত্র বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং ওই সমবেত অনশনে শামিল হওয়ার জন্য আন্তরিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।

১৩ জুলাই, ১৯২৯ (রবিবার) থেকে সমবেত অনশন (Group Hunger Strike) যথারীতি শুরু হয়। ওই অনশন আরম্ভ করার ঠিক দু-এক দিন আগে যতীন তাঁর সহযোদ্ধাদের অঙ্গীকার করিয়ে নেন যে, তাঁদের দাবিগুলোর যথাযথ মীমাংসা হয়ে গেলে তাঁরা অবশ্যই অনশন ভঙ্গ করবেন। তবে যতীন্দ্রনাথ করবেন না। কেন-না, তাঁর পক্ষে এই অনশনই হবে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের এক অভাবনীয় সুযোগ।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি একটি স্বপ্ন লালন করে আসছেন মনে মনে। তা হলো পলাশির প্রান্তরে বাঙালি মিরজাফরকৃত বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করা। সহযোদ্ধাদের তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে এব্যাপারে তাঁর পিতা বঙ্কিমবিহারী দাশের অনুমতি আগেই তাঁর পাওয়া হয়ে গেছে।

১৩/৭/১৯২৯ থেকে ১৯/৭/১৯২৯ — সাতটি দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। আট দিনের দিন (২০ জুলাই তারিখে) ভোরবেলা জেল-সুপার জেল-ডাক্তার ও আটজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট পাঠানকে সঙ্গে নিয়ে যতীনের সেলে প্রবেশ করলেন। তারপর কোনোরকম সংকেত না দিয়েই ওই আটজন পাঠান একই সঙ্গে আট দিন অভুক্ত ও বিশেষ দুর্বল যতীনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওই সুযোগে ডাক্তার একটা সরু নল যতীনের নাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দুধ ঢালতে শুরু করে দেন। আর কোনো উপায় না দেখে যতীন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে জোরে জোরে কাশতে থাকেন। ফলে ওই নলটির মুখ খাদ্যনালী থেকে সরে গিয়ে শ্বাসনালীর মধ্যে ঢুকে যায় এবং কিছুটা দুধও যতীনের ফুসফুসে ঢুকে যাওয়ায় যতীন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

৪৮ ঘণ্টা পরে (২২ জুলাই, ১৯২৯) যতীনের জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলতেই তিনি লক্ষ করেন যে তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্য সেল-ভরতি ঘরে নানা ধরনের খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আরও বুঝতে পারলেন যে তাঁর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। তাছাড়াও লক্ষ করলেন যে তাঁর পাশে রাখা হয়েছে সদ্য কেনা একটা শ্লেট ও একটা পেনসিল। বুঝতে বাকি রইল না যে জীবনে আর কথা কইতে পারবেন না বলেই এখন থেকে সব কিছু ওই শ্লেটে লিখে জানাতে হবে। ওই দিনই সন্ধেবেলা (২২/৭/১৯২৯) ছোটোভাই কিরণ দাশও এসে হাজির। বলাবাহুল্য, যতীনের ওই সঙ্গিন অবস্থা উপলব্ধি করে স্বয়ং বড়োলাট লর্ড আরউইন তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে যতীনকে দেখাশোনা করার জন্যই কিরণ দাশকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আনিয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং ৬৩ দিনের ওই ঐতিহাসিক অনশনের ৫৩ দিনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হয়ে রইলেন স্বয়ং ছোটো ভাই কিরণ দাশ।

১১ আগস্ট (১৯২৯) বড়োলাট লর্ড আরউইন এক বিশেষ জরুরি ঘোষণায় অনশনকারীদের দাবিদাওয়া সব মেনে নিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে জেল অনুসন্ধান কমিটি স্থাপনেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে ১২ আগস্ট (৩১ দিনের দিন) যতীনের ১৭ জন সহযোদ্ধা অনশন প্রত্যাহার করে নেন। শুরু হয় অগ্নিযুগের এক অবিস্মরণীয় রক্তে রাঙা অধ্যায়।

আগস্টও যায় যায়। শরীর সব দিক থেকেই ভেঙে পড়েছে — পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন যতীন একটু একটু করে।

৫০ দিনের দিন (৩১ আগস্ট) দেখা গেল যে, পক্ষাঘাত তাঁর সমস্ত শরীর গ্রাস করে ফেলেছে। যখন ওই পক্ষাঘাত যতীনের হৃদযন্ত্রকে স্পর্শ করবে তখুনি তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এত দিনে টনক নড়ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের। কিন্তু তবুও শাসকরা যতীন্দ্রকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে রাজি নয়। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাশ ও ছোটোভাই কিরণচন্দ্র ঘৃণাভরে জামিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর এক সর্বজননিন্দিত গুপ্তচরের জামিনে যতীনকে মুক্ত করা হয় পঞ্চান্ন দিনের দিন (৫/৯/২৯)। পরের দিন (৬/৯/২৯) একেবারে কাকভোরে

ডাক্তার ও জেল-সুপার অ্যাম্বুলেন্স ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে জেলে প্রবেশ করে দেখেন যে যতীনের সহযোদ্ধারা তার সেলের চারপাশে ব্যারিকেড রচনা করে পথ অবরোধ করে শুয়ে আছে। তখন ডাক্তার জেল-সুপারকে বোঝান যে রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। কেন-না জোর করে যতীনকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার চেষ্টা করলেই উত্তেজনায় যতীনের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

পরের সাতদিন (৭/৯/২৯ থেকে ১৩/৯/২৯) হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের মানুষ দারুণ উদবেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে থাকেন। শেষপর্যন্ত এল শেষের সেই ভয়ংকর দিনটা — শনিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ তারিখে ঠিক দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে অমর বিপ্লবী যতীন দাশ চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন।

লাহোর থেকে যতীনের মরদেহ হাওড়া পৌঁছোতে তিন দিন লেগেছিল। কারণ প্রায় প্রত্যেক স্টেশনেই শ্রদ্ধাবনত দেশবাসী ট্রেন থামিয়ে ওই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। শবাধার গ্রহণ করতে হাওড়ায় উপস্থিত ছিলেন — সুভাষচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও শ্রীমতী কমলা নেহরু প্রমুখেরা। সরকারি হিসেবেই পাঁচ লক্ষ মানুষ হাওড়া থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত শবানুগমন করেছিলেন। খবরটা শোনামাত্র ক্ষোভে ও দুঃখে মর্মাহত কবি রাত্রি জেগেই লিখে ফেলেছিলেন —

সর্বখর্ব তারে দহে তব ক্রোধদাহ —
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহো।

হাতে কলমে

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২৬-২০১১) : জন্ম নদীয়া জেলার রাণাঘাটে। পড়াশোনা সেন্ট পলস কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ফুটবল বিশেষজ্ঞ ও আকাশবাণীতে ফুটবলের ইংরাজি ধারাভাষ্যকার ছিলেন। তাঁর রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল *স্বাধীনতার রূপকার নেতাজি সুভাষ*, *ইতিহাসের পাতা থেকে*।

১.১ আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় কোন খেলার ধারাভাষ্যকার ছিলেন?

১.২ তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ যতীন দাশ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

২.২ যতীন দাশের পিতার নাম কী ছিল?

২.৩ যতীন দাশের পিতা কোথায় চাকরি করতেন?

২.৪ যতীন দাশের ছদ্মনাম কী ছিল?

২.৫ হিন্দ নওজোয়ান সভা কে প্রতিষ্ঠা করেন?

২.৬ মি. প্যাট্রি কে ছিলেন?

২.৭ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের কোন জেলে বদলি করা হয়?

২.৮ কারা যতীনের জামিনের প্রস্তাব ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করেন?

৩. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণ ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

অংশ, উত্তীর্ণ, ঐতিহাসিক, আক্রান্ত, জীবন, ভোজন, পিতা, সন্দেহ, জাতীয়, মেয়াদ।

৪. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :** পর্যন্ত, কিন্তু, প্রত্যক্ষ, সিদ্ধান্ত, যতীন্দ্র, ব্যগ্র।

৫. **নীচে কতগুলি শব্দ দেওয়া হলো। শব্দগুলির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত করে নতুন শব্দ তৈরি করো :**

জীবন, শেষ, বেশ, পথ, ঠিক, দারুণ, উপায়, জ্ঞান, করণীয়।

৬. **নীচে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাল তারিখ দিয়ে দেওয়া হলো। ঘটনাগুলি গল্প থেকে খুঁজে লেখো :**

২৭ অক্টোবর ১৯০৪; ৮ এপ্রিল ১৯২৯; ২৫ জুন ১৯২৯; ১১ অগস্ট ১৯২৯; ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯।

শব্দার্থ : আমরণ অনশন — মৃত্যু পর্যন্ত উপবাস। পিকেটিং — দাবি আদায়ের জন্য দলবদ্ধভাবে অবস্থান। মেয়াদ — ধার্য সময় বা কাল। দুর্গম — যেখানে অতিকষ্টে যাওয়া যায়। অবৈতনিক — বেতন নেয় না এমন। আনুগত্য — বশ্যতা। প্রত্যাহার — ফিরিয়ে নেওয়া। ব্যবস্থাপক — নিয়ম বিধান বা আইন গঠনকারী। যাবজ্জীবন — চিরজীবন, আমরণ। অঙ্গীকার — প্রতিজ্ঞা। নিরুপদ্রব — উৎপাতহীন, নিরাপদ। প্রলুব্ধ — অত্যন্ত লোভযুক্ত, আকৃষ্ট।

৭. **নীচের বাক্যগুলি থেকে সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ বেছে লেখো :**

৭.১ তাঁরা সব মিলিয়ে দশ ভাই বোন ছিলেন।

৭.২ যতীন ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউটিশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

৭.৩ বিচারে তাঁর ছয় মাসের জেলা হয়।

৭.৪ তাঁর দ্বিতীয় ছদ্মনাম হয় 'কালীবাবু'।

৮. **নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও :**

৮.১ কিশোর বিপ্লবী হিসেবেই যতীন্দ্রনাথ দাশের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

৮.২ ছেলেবেলা থেকেই তিনি একটি স্বপ্ন লালন করে আসছেন মনে মনে।

৮.৩ শুরু হয় অগ্নিযুগের এক অবিস্মরণীয় রক্তে রাঙা অধ্যায়।

৮.৪ শেষ পর্যন্ত এল শেষের সেই ভয়ংকর দিনটা।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

৯. **নীচের বাক্যগুলির মধ্যে যে সব বিভক্তিযুক্ত শব্দ এবং অনুসর্গ আছে তা খুঁজে লেখো :**

৯.১ জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্য ভগৎ সিং, ভগবতী চরণ শুক্লা এবং আরও কয়েকজন কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করেন।

৯.২ ছেলেবেলা থেকে তিনি একটি স্বপ্ন লালন করে আসছেন মনে মনে।

৯.৩ সাতটি দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল।

৯.৪ শরীর সবদিক থেকেই ভেঙে পড়ছে।

১০. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১০.১ যতীন দাশের পিতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থায়ী চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন কেন? এর ফল কী হয়েছিল?

১০.২ ‘... তোমার মতো মহান বিপ্লবীর জন্য ও একটা কাজ আমায় অবশ্যই করতে হবে’— কে কাকে একথা বলেছিলেন?

১০.৩ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে কী ঘটেছিল?

১০.৪ ১৪ জুন ১৯২৯ যতীন দাশকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়?

১০.৫ ১৯২৯ সালের ১৩ জুলাই অনশন শুরু হয় কেন?

১০.৬ অনশন করার আগে যতীন তাঁর সহযোদ্ধাদের কী অঙ্গীকার করান? তিনি অনশন ভঙ্গ করবেন না কেন?

১০.৭ জেলে অনশনের সময় যতীন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন কেন?

১০.৮ জেলে যতীন দাশের পাশে শ্লেট পেন্সিল রাখা হয়েছিল কেন?

১০.৯ কিরণ দাশকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আনা হয়েছিল কেন?

১০.১০ যতীন দাশের সহযোদ্ধারা পথ অবরোধ করে শুয়েছিলেন কেন?

১১. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর দাও :

১১.১ যতীন দাশের মতো ভারতের অন্য কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনকথা জানা থাকলে খাতায় লেখো।

১১.২ যতীন দাশের মৃত্যুর খবর পেয়ে বাংলার এক বিশিষ্ট কবি তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবির পরিচয় লিখে তাঁর অন্য কোনো কবিতা তোমার ভালো লাগে কিনা এবং কেন ভালো লাগে সে সম্পর্কে লেখো।

গান

চল রে চল সবে ভারত সন্তান

চল রে চল সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে সাধ রে সাধ সবে দেশেরি কল্যাণ
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন?
উঠ জাগ সবে, বলো মাগো, তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান
দেশ দেশান্তে যাও রে আনতে নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে নব উৎসাহে মাতো, উঠাও রে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন না করি দৃকপাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায় তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু মুসলমান,
এক পথে এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা নিশান।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) : বিখ্যাত নাট্যকার, সংগীতকার, সম্পাদক এবং চিত্রশিল্পী। কনিষ্ঠভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশে এই মানুষটির অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সংগীতসংক্রান্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'স্বরলিপি গীতিমালা' বিখ্যাত। সংগীতবিষয়ক পত্রিকা 'বীণাবাদিনী' এবং 'সঙ্গীত প্রকাশিকা'-র সম্পাদক ছিলেন।

মোরা দুই সহোদর ভাই

কাজী নজরুল ইসলাম

হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।
এক বৃন্তে দুটি কুসুম এক ভারতে ঠাঁই
দুই সহোদর ভাই ।।

সৃষ্টি যাঁর মুসলিম রে ভাই হিন্দু সৃষ্টি তাঁরই
মোরা বিবাদ করে খোদার উপর করি যে খোদকারি।
শাস্তি এত আজ আমাদের হীন-দশা এই তাই
দুই সহোদর ভাই ।।

দুই জাতি ভাই সমান মরে মড়ক এলে দেশে
বন্যাতে দুই ভাইয়ের কুটির সমানে যায় ভেসে।
দুই জনারই মাঠেরে ভাই সমান বৃষ্টি ঝরে—
সব জাতিরই সকলকে তাঁর দান যে সমান করে
চাঁদ সুরুযের আলো কেহ কম-বেশি কি পাই
বাইরে শুধু রঙের তফাত ভিতরে ভেদ নাই
দুই সহোদর ভাই ।।

হাতে কলমে

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) : কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা *মুক্তি* প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁর কবিতা কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, তাঁর বিদ্রোহী চেতনা সমাজের সমস্ত রকম অসাম্য, অন্যায় এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তাঁর কবিতার আর একটি বিশেষত্ব হলো হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ঐতিহ্যের সার্থক মেলবন্ধন। তাঁর রচিত বইগুলির মধ্যে রয়েছে — *অগ্নিবীণা*, *বিষের বাঁশি*, *সাম্যবাদী*, *সর্বহারা*, *ফণীমনসা*, *প্রলয়শিখা* প্রভৃতি।

পাঠ্য কবিতাটি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত ‘নজরুল রচনা সমগ্র (সপ্তম খণ্ড)’ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল?

১.২ তাঁর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

শব্দার্থ: সহোদর – একই মায়ের সন্তান। বৃন্ত – বোঁটা। কুসুম – ফুল। ঠাঁই—স্থান, আশ্রয়। বিবাদ – ঝগড়া। হীন-দশা – দুরবস্থা। খোদকারি – অসঙ্গত, অনুচিত হস্তক্ষেপ। মড়ক – মৃত্যুমিছিল।

২. নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ ‘মোরা দুই সহোদর ভাই’ কবিতায় ‘সহোদর’ কারা?

২.২ ‘আমাদের হীন-দশা এই তাই’ — আমাদের এই ‘হীন-দশা’র কারণ কী?

২.৩ ‘বাইরে শুধু রঙের তফাত ভিতরে ভেদ নাই’ — ‘রঙের তফাত’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৩.১ ‘এক বৃন্তে দুটি কুসুম এক ভারতে ঠাঁই।’ — পঙ্‌ক্তিটিতে প্রদত্ত উপমাটি ব্যাখ্যা করো।

৩.২ ‘সব জাতিরই সকলকে তাঁর দান যে সমান করে’— কার, কোন দানের কথা এখানে বলা হয়েছে?

৩.৩ 'চাঁদ সুরুযের আলো কেহ কম-বেশি কি পাই'

— 'চাঁদ সুরুযের আলো' কী ? কবির এই প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৪. **নীচের বাক্যগুলি থেকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া চিহ্নিত করে লেখো :**

৪.১ মোরা বিবাদ করে খোদার উপর করি যে খোদকারি।

৪.২ দুই জাতি ভাই সমান মরে মড়ক এলে দেশে।

৪.৩ সব জাতিরই সকলকে তাঁর দান যে সমান করে।

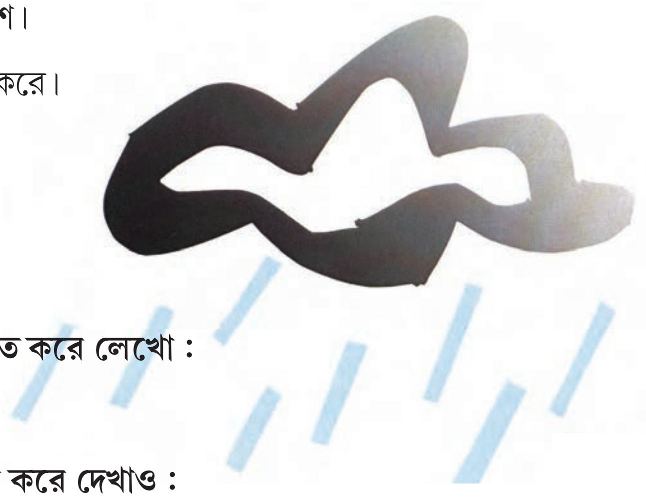

৫. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

সহোদর, সৃষ্টি, বৃষ্টি, শান্তি।

৬. **'বি' উপসর্গ যোগে পাঁচটি শব্দ তৈরি করো।**

৭. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণে রূপান্তরিত করে লেখো :**

কুসুম, ভারত, সৃষ্টি, বিবাদ, জাতি, রং।

৮. **নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও :**

৮.১ হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।

৮.২ দুই জনারই মাঠেরে ভাই সমান বৃষ্টি ঝরে।

৮.৩ বন্যাতে দুই ভাইয়ের কুটির সমানে যায় ভেসে।

৮.৪ চাঁদ সুরুযের আলো কেহ কম বেশি কি পাই।

ধরাতল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটো কথা, ছোটো গীত, আজি মনে আসে।
চোখে পড়ে যাহা-কিছু হেরি চারি পাশে।
আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়া তরণী,
কূলে কূলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী।
সবই বলে, 'যাই যাই' নিমেষে নিমেষে,
ক্ষণকাল দেখি ব'লে দেখি ভালোবেসে।
তীর হতে দুঃখ সুখ দুই ভাইবোনে
মোর মুখপানে চায় করুণ নয়নে।
ছায়াময় গ্রামগুলি দেখা যায় তীরে—
মনে ভাবি, কত প্রেম আছে তারে ঘিরে।
যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক নয়ানে
আমার পরান হতে ধরার পরানে—
ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার-আলো
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

হাতেকলমে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথাকাহিনী*, *সহজপাঠ*, *রাজর্ষি*, *ছেলেবেলা*, *শিশু*, *শিশু ভোলানাথ*, *হাস্যকৌতুক*, *ডাকঘর* প্রভৃতি রচনা শিশু ও কিশোর মনকে আলোড়িত করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে *Song Offerings* (গীতাঞ্জলি)-এর জন্য এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

পাঠ্য কবিতাটি তাঁর *চৈতালি* নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

১.১ কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি গীতিনাট্যের নাম লেখো।

১.২ তোমাদের পাঠ্যকবিতাটি তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া?

২. নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১ কবির মনে আজ কী ভাবনা এসেছে?

২.২ যেতে যেতে নদীতীরে কবির চোখে কোন দৃশ্য ধরা পড়েছে?

২.৩ সবাই প্রতি মুহূর্তে কী কথা বলছে?

২.৪ যা কিছু দেখেন তাকেই কবি ভালোবাসেন কেন?

২.৫ কবি কাদের ভাইবোনের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

২.৬ গ্রামগুলি দেখে কবির কী মনে হয়েছে ?

২.৭ পৃথিবীর দিকে তাকালে কবির কী মনে হয়?

শব্দার্থ : ধরা — পৃথিবী। হেরি— দেখি। ধরণী— পৃথিবী। তরণী— নৌকো। শ্যামল— সবুজ। নিমেষ—মুহূর্ত। নয়ন/নয়ান— চোখ। উৎসুক— ব্যগ্র। পরান— প্রাণ, জীবন। বাহিয়া— বেয়ে।

৩. নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :

শ্যামল, দুঃখ, সুখ, করুণ, ছায়াময়, গ্রাম, উৎসুক, আলো।

৪. শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ নিয়ে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো :

বাহিয়া	>	
	>	দেখি
মোর	>	
	>	পরান

বেয়ে, প্রাণ, আমার, হেরি

৫. দুটি বিপরীতার্থক শব্দ যুক্ত হয়ে একটি শব্দে পরিণত হওয়া শব্দগুলি কবিতা থেকে খুঁজে বের করো। ওই শব্দগুলি দিয়ে একটি করে বাক্য লেখো।

৬. **নীচের বাক্যগুলির রেখাঙ্কিত অংশে কোন বচনের ব্যবহার হয়েছে লেখো :**

৬.১ চোখে পড়ে যাহা কিছু হেরি চারি পাশে।

৬.২ কূলে কূলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী ।

৬.৩ ‘ক্ষণকাল দেখি বলে দেখি ভালোবেসে’।

৬.৪ সবি বলে, ‘যাই যাই ’ নিমেষে নিমেষে।

৬.৫ যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক নয়ানে।

৭. **নীচের কবিতাংশটি ভেঙে পৃথক পৃথক বাক্যে লেখো :**

যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক নয়নে
আমার পরান হতে ধরার পরানে—
ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার-আলো
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৮.১ ‘আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়া তরণী’— এখানে ‘যেন’ শব্দটি কেন ব্যবহার হয়েছে লেখো।

৮.২ কবির কল্পনার নৌকাযাত্রায় কী কী দৃশ্য তিনি দেখছেন?

৮.৩ সুখদুঃখকে কবির ভাইবোন মনে হয়েছে কেন?

৮.৪ ‘মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো’— কখন পৃথিবীকে ভালো মনে হয়? এরকম মনে হবার কারণ কী?

৮.৫ ট্রেন, নৌকো বা দূরপাল্লার বাসে করে যেতে যেতে পথের দুধারে যা দেখেছ তার বর্ণনা দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

মিলিয়ে পড়ো ‘ধরাতল’ কবিতায় নদীর কথা আছে। এখানে নদীর আরেক রূপ তোমাদের সামনে ফুটে উঠবে।

সেথায় যেতে যে চায়

বন্দে আলী মিয়া

রাখাল ছেলে গোরু চরায় মধুমতীর চরে
তাহার পানে চেয়ে আমার মন যে কেমন করে।
ওই চরেতে সারাটি দিন পাখির কোলাহল
চারদিকে তার গান গেয়ে যায় পদ্মানদীর জল।
শ্যামল কচি দূর্বা ঢাকা চরের আঙনখানি
বিহান বেলায় জাগে সেথায় আলোর ঝলকানি।
কাশ ফুলেরা দোলায় চামর নদীর কিনারায়
সারাটি দিন ফড়িং শালিক উড়ে উড়ে যায়।
সাধ হয় যে বাঁধি হোথায় ঘর
মাটি মায়ের সঙ্গে থাকি সারা জীবন ভর।
গাঙের কূলে বসে একা শামুক কুড়াইয়া
মালা গেঁথে নেব আমার বুকে দোলাইয়া।
পাখির পালক কানে গুঁজে চলে গুঁজে লবো
দুপুরবেলা ওপার থেকে এপার চেয়ে রবো।
নদীর জলে পাল তুলিয়া কতই যাবে না’
কোথায় যাবে বাঁক ছাড়ায়ে নাইকো ঠিকানা।
ডিঙি বেয়ে ওপার থেকে আসবে সকল জেলে
ধরবে ইলিশ রুই কাতলা খ্যাপলা জাল ফেলে।
ডিঙির ’পরে মাছেরা সব লাফিয়ে হবে সারা
একজনা সে বাগিয়ে লাঠি দেবে গো পাহারা।
কূলে বসি যখন চিল চাইবে সে-দিক পানে।

ডিঙির ’পরে মাছেরা সব লাফিয়ে হবে সারা
একজনা সে বাগিয়ে লাঠি দেবে গো পাহারা।
কূলে বসি যখন চিল চাইবে সে-দিক পানে।
গাঙচিলেরা উড়বে খালি চুরির সন্ধানে।
মধুমতীর চরে
নিশীথ রাতে জোস্না ধারা চাঁদ হতে যায় ঝরে।
সাঁঝ বিহানে নরম রোদে জাগে রঙের খেলা
হোথায় গিয়ে আজকে আমি কাটিয়ে দেবো বেলা।

হাবুর বিপদ

অজেয় রায়

স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাবু ভাবল, থাক ফিরে যাই।

গরমকাল। মর্নিং স্কুল হচ্ছে। আর কয়েক মিনিট পরে সাতটা বাজবে। ঘন্টা পড়বে স্কুল আরম্ভের। একতলা স্কুল বাড়িটার ঘরে ঘরে ছেলেদের কলরব। উঠানে কিছু ছেলে খেলছে। হাবুর মনে ভেসে ওঠে সুধীরবাবুর ভারিক্কি চেহারা। গম্ভীর মুখ, মোটা চশমার কাচের আড়ালে বড়ো বড়ো দুটি চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি। হাবু জানে স্যার তাকে পছন্দ করেন! কিন্তু তা বলে ক্লাসের কাজে অবহেলা ক্ষমা করার লোক নন তিনি।

যদি স্কুলে না যায়? সময় কাটাবার জায়গার অবশ্য অভাব নেই। দত্তদের আমবাগানে ঢুকলেই খাসা সময় কেটে যাবে। কিন্তু ক্লাস কামাই করলে কাল বাবার কাছ থেকে চিঠি আনতে হবে, অনুপস্থিত হওয়ার কারণ দর্শিয়ে। তখন? বাবাকে কী কৈফিয়ত দেবে? বই হাতে স্কুলে বেরিয়ে, গিয়েছিলে কোন চুলোয়? অতঃপর অবধারিত মারাত্মক পরিণতির কথা ভেবে হাবু শিউরে ওঠে। ভীষণ রাগ হতে থাকে ভজার ওপর। ওর পাল্লায় পড়েই এই গন্ডগোল। হাবু তো প্রথমে রাজি হয়নি। ভজাটা কিছুতেই ছাড়ল না। এখন?

বাবা না সুধীরবাবু? না, না, বাবা কিছুতেই নয়। যদি বরাতে দুর্ভোগ থাকে স্যারের হাতেই হোক। হাবু স্কুলে ঢুকে পড়ে।

উঁহু, আজ লাস্ট বেঞ্চ নয়। ওটার ওপর স্যারেদের চিরকাল কড়া নজর। মাঝামাঝি বসা যাক। ভাগ্যে থাকলে পাঁচজনের ভিড়ে মিশে হয়তো এ যাত্রা পার পেয়ে যেতে পারে। থার্ড বেঞ্চের এক কোণে তিনকড়ির পাশে হাবু বসে পড়ল।

পর পর তিনটে ক্লাস কেটে গেল। এবার আসবেন সুধীরবাবু। বাংলা রচনার ক্লাস। তারপর টিফিন। হাবু বাইরে যতটা সম্ভব শান্ত থাকবার চেষ্টা করছে। বুকের মধ্যে কিন্তু তার হাপর পড়ছে।

সুধীরবাবুর ধীর পদক্ষেপে ক্লাসে ঢুকলেন। দশাসই মানুষটির পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। কাঁধে পাট করা সাদা চাদর। ছাত্ররা তাঁকে ভয় ভক্তি দুটোই করে। ছাত্রদের উন্নতির জন্য তিনি প্রচুর খাটেন। তবে বড্ড কড়া মাস্টার।

চেয়ারে বসে সুধীরবাবু প্রশ্ন করলেন, গতবারে কী রচনা লিখতে দিয়েছিলাম?

—বাংলাদেশে বর্ষাকাল।

—ও হ্যাঁ। সবাই লিখে এনেছে?

হ্যাঁ স্যার! ক্লাস সুদ্ধু ছেলের ঘাড় হেলে।

—বেশ কয়েকটা শোনা যাক।

ছেলেরা যে যার রচনাখাতা বের করে ওপরে রাখে।

এইটাই সুধীরবাবুর মেথড। কয়েকজনকে বেছে বেছে পড়তে বলেন। অন্যদের বলেন মন দিয়ে শুনবে। অন্যদের লেখা শুনলে নিজের লেখার মান সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে। আমি তো সবার খাতা বাড়ি নিয়ে গিয়ে শুধরে দেব। কিন্তু প্রত্যেকের লেখা তো প্রত্যেকে পড়তে পারবে না। অন্তত ক্লাসে কয়েকখানা রচনা শোনো। কে কেমন লিখেছে কিছুটা জানো।

—প্রফুল্ল পড়। সুধীরবাবু আদেশ দিলেন।

প্রফুল্ল খাতা খুলে 'বাংলাদেশে বর্ষাকাল' পড়তে আরম্ভ করে।

পাতা দুই শোনার পর হঠাৎ সুধীরবাবু ধমকে ওঠেন—থাম। আমি রচনা লিখতে বলেছি। বই থেকে কপি করতে বলিনি।

কেন স্যার—প্রফুল্ল আমতা আমতা করে।

—আবার কেন? দে সরকারের রচনার বই থেকে হুবহু টুকে এনেছ। এ চলবে না। কাল নতুন করে লিখে এনে দেবে। আর কষ্ট করে আরও দু-একখানা বই উলটিও। মনে থাকবে?

—নিতাই? —এবার তাঁর লক্ষ লাস্ট বেঞ্চ।

নিতাই নামকরা ফাঁকিবাজ। প্রথমটা ভান করল যেন শুনতেই পায়নি।

—নিতাই! —আমাকে বলছেন স্যার?

—হ্যাঁ, ক্লাসে আর কটা নিতাই আছে? পড়।

নিতাই মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি হলো?

—আজ্ঞে লিখতে পারিনি।

—কেন?

আজ্ঞে সময় পাইনি, মায়ের অসুখ।

—ও তোমায় বুঝি মায়ের সেবা করতে হয়েছে। দুই দিদি কী করছিল? —আজ্ঞে বারবার ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, করতে হয়েছে কিনা। বাবার মোটে সময় নেই। তাই।

—কি হয়েছে তোমার মায়ের?

—জ্বর, সর্দি, কাশি।

—এখন কেমন আছেন?

—জ্বর ছেড়েছে। আজ ভাত খেয়েছেন।

—মিথ্যাবাদী! সুধীরবাবুর গর্জনে সারা ক্লাস কেঁপে ওঠে। গতকাল তোমার মাকে দেখেছি গোঁসাই বাড়িতে কীর্তন শুনছেন। দাঁড়িয়ে থাক ওই কোণে। টিফিনেও বেরোবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে। কালকেই তোমার রচনা চাই। এই নিয়ে পরপর দু-দিন হলো। ফের যদি রচনা আনতে ভুল হয়, তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। মনে থাকবে?

'মনে থাকবে,' সুধীরবাবুর একটি মুদ্রাদোষ। মনে থাকুক না থাকুক, তিনি সবাইকে বলে যান—মনে থাকবে?

—প্রশান্ত।

ফার্স্ট বয় প্রশান্ত খাতা বাগিয়ে বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বেশ দীর্ঘ রচনা। সুন্দর গুছিয়ে লেখা। বর্ষার বর্ণনায় কয়েকটা তালমাফিক কবিতার উদ্ধৃতিও হয়েছে। সুধীরবাবু মন দিয়ে শোনেন।

তবে ছেলেরা লক্ষ করে স্যারের কপালের মাঝখানে একটি ভাঁজ। অর্থাৎ তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন। ওই ভাঁজ তার চিহ্ন।

প্রশান্তের পাঠ শেষ হলে সুধীরবাবু বললেন, ভালো হয়েছে, তবে আরেকটু মৌলিক হওয়া উচিত। শুধু রচনা বইগুলোর ওপর নির্ভর করবে কেন? চাই নিজস্ব ভাব, ভাষা। নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তবেই রচনার প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য আসবে। মনে থাকবে?

প্রশান্ত একটু ক্ষুণ্ণ মনে বসে পড়ে।

সুধীরবাবুর সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরছে।—হাবুলচন্দ্র!

হাবু নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—হাবুল।

হাবু এবার উঠে দাঁড়ায়! উঃ কি ভাগ্য তার!

—পড়ো তোমার রচনা।

হাবু একটু ইতস্তত করে কয়েকবার ঢোঁক গেলে! —আঃ দেরি করছ কেন?

হাবু হাইবেঞ্চে রাখা বইখাতাগুলোর ওপর থেকে একটা খাতা তুলে নিল। খাতা খুলে নাকের সামনে মেলে ধরে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

—কই আরম্ভ করো। বড্ড সময় নিচ্ছ। সুধীরবাবু তাড়া দেন।

—হ্যাঁ স্যার। হাবু পড়তে শুরু করে—

আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাসকে বাংলাদেশে বর্ষাকাল বলে। এই দুই মাসে প্রচুর বৃষ্টি পড়ে তাই এই ঋতুর নাম বর্ষা। বর্ষার আগে গ্রীষ্মকাল। প্রচন্ড গরম পড়ে তখন। মাঠঘাট শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। ডোবা পুকুরে জল যায় মরে। সূর্যের তাপে মানুষজন পশুপাখি গাছপালা সবাই হাঁসফাঁস করতে থাকে। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হয় বটে, তবে বৃষ্টি দু-এক পশলা। ঝড়ের দাপটটাই হয় বেশি। জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি

আকাশে কালো কালো মেঘ জমতে শুরু করে। আষাঢ় মাসে নামে অঝোর বৃষ্টিধারা। বর্ষা এসে সব কিছু ভিজিয়ে দেয়। প্রকৃতি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

হাবু প্রথম দিকটাই ঠেকে ঠেকে আস্তে আস্তে পড়ছিল। ক্রমে তার পড়ার গতি বাড়ে, বেশ ঝরঝর করে বলে চলে।

বর্ষা নামে বাংলাদেশের সব জায়গায়। শহরে গ্রামে জঙ্গলে পাহাড়ে। শহরে বর্ষা কোনোদিন দেখিনি, তবে গ্রামে থাকি কিনা তাই প্রতি বছরই বর্ষাকালে গ্রামের অবস্থা কেমন হয় বেশ জানি। দেখতে দেখতে মজে যাওয়া পুকুর ডোবা খাল বিল জলে ভরে ওঠে। রাস্তাঘাট হয় কাদা প্যাচপ্যাচে। চলতে ফিরতে তখন ভারি অসুবিধা। কাগজে পড়েছি শহরের রাস্তাটাস্তা ভালো। কাদা হয় না। কিন্তু সেখানেও রাস্তায় জল জমে। কাগজে ছবি দেখেছি কলকাতার কোথাও কোথাও এক কোমর জল দাঁড়িয়েছে। লোকে নৌকো চালাচ্ছে।

অ্যাই তিনকড়ি মুখ নামাও। সুধীরবাবু ধমকে ওঠেন।

তিনকড়ি হাঁ করে হাবুর খাতার পানে চেয়েছিল। তৎক্ষণাৎ ঘাড় নামায়। হাবুও চমকে পড়া বন্ধ করে।

হুঁ। তারপর। সুধীরবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেন। হাবু আরম্ভ করতে একটু দেরি করে খাতার ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে।

কী হলো? নিশ্চয় নিজের হাতের লেখা নিজেই পড়তে পারছে না। নাঃ, বকে বকেও হাতের লেখার উন্নতি করা গেল না ছেলেটার। সুধীরবাবু ভাবেন।

হাবু আবার পড়ে—

তবে বর্ষাকালে চাষিদের ভারি ফুর্তি। বৃষ্টি ভালো হলে চাষ ভালো হবে। অনেক ফসল উঠবে ঘরে।

যে বছরে বৃষ্টি কম হয় সেবার তাদের মাথায় হাত। বাগদিপাড়ার রামু অনাবৃষ্টির বছরে আমাদের গোলা থেকে ধান নিয়ে যায়। নইলে যে তার ছেলে বউ না খেতে পেয়ে মরবে। বেশি বৃষ্টির আবার বিপদ আছে। নদীতে বন্যা হয়। আগের বছর আমাদের গাঁয়ের পাশে খরস্রোতা নদীতে বান ডাকল। দু-পাশের মাঠ ভেসে গেল। কত শস্যক্ষেত ডুবে নষ্ট হলো। গাঁয়ের মধ্যেও জল ঢুকে এসেছিল। ছোটো ছোটো অনেক মাটির ঘর পড়ে গেল। মাঝ রাত্তিরে বান এসেছিল। ভাগ্যিস দুলে মাঝি হাঁক দিয়ে ডেকে সব্বাইকে সাবধান করে দিল, নইলে অনেকে ভেসে যেত। আমাদের বাড়িতে অনেক পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছিল সে রাতে।...

সুধীরবাবু মন দিয়ে শোনেন। খাসা লিখেছে। বই-টইয়ের ধার ধারেনি। সব নিজের অভিজ্ঞতা। ভাষ্যটিও সুন্দর। ছেলেটা চর্চা রাখলে বড়ো হয়ে নির্ঘাত সাহিত্যিক হবে।

ফার্স্টবয় প্রশান্ত পাশের ছেলেকে কনুই দিয়ে মৃদু খোঁচা মারল।—শুনছিস? স্রেফ আবোল তাবোল। পয়েন্ট কই? সে ফিশফিশিয়ে বলে।

—তিনকড়ে।

তিনকড়ে আবার ঊর্ধ্বগ্রীবা বিস্ফারিত নয়নে হাবুর মুখের দিকে চেয়েছিল। স্যারের ধমক শুনে মাথা নামায়।

হাবু পড়ে যায়। বর্ষাকালে তার গ্রামের জীবনের নানা বিচিত্র কাহিনি।

বর্ষায় নাকি অসুখ বিসুখ খুব বাড়ে। বিশেষত পেটের অসুখ আর সর্দিজ্বর। তার ডাক্তার বাবা নাকি নাওয়া খাওয়ার সময় পান না তখন। গাছে গাছে নতুন সবুজ পাতা বেরোয়। কখনও কখনও সারারাত টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়। আর ব্যাংগুলো পাল্লা দিয়ে হেঁড়ে গলায় গান জোড়ে। হাবু শুয়ে কান পেতে শোনে, ভারি মজা লাগে। জলে গর্ত বুজে যাওয়ায় মাঝে মাঝে ঘরের দাওয়ায় সাপ উঠে আসে। প্রত্যেক বছরই গ্রামের দু-একজনকে সাপে কামড়ায়।

ভোরবেলা চাষিরা লাঙল কাঁধে হেট হেট করে গোরু তাড়িয়ে খেতে যায়। দুপুরেও মাঠে থাকে। তাদের ঘরের লোক ভাত নিয়ে যায় দুপুরে খাবার জন্যে।

আরও অনেক কিছু লিখেছে সে। মাঝে মাঝে পাতা উলটিয়ে বলে চলে।

বর্ষাকালে গ্রামে তাদের কী সব পালা পার্বণ ব্রত হয়। ওই সময় স্কুলে নাকি ছাত্র কম আসে। তাদের খেতে কাজ করতে হয় তাই ছুটি নেয়। হাবুর কাজ করার দরকার নেই। তাই রোজ স্কুলে আসতে বাধ্য হয়। এমনি কত কী—

হাবুর রচনা শেষ হল। সুধীরবাবু স্মিতমুখে বললেন—বেশ হয়েছে। নিজের দেখা জিনিস লিখেছে। খুব ভালো। তবে আর একটু গুছিয়ে লেখা দরকার।

তিনি ঘড়ি দেখলেন। ক্লাস শেষ হতে আর পনেরো মিনিট বাকি। এবার সামনের সপ্তাহের রচনার বিষয়টা দিয়ে দেবেন আর এ সপ্তাহের খাতাগুলো নিয়ে নেবেন সংশোধনের জন্য।—হরিপদ খাতা নাও।

মনিটর হরিপদ প্রত্যেকের কাছে গিয়ে রচনা খাতা সংগ্রহ করতে লেগে যায়। সুধীরবাবু ভাবেন আসছে বারে কী রচনা দেওয়া যায় ঠিক আছে—দুর্গা পূজা। দুর্গাপূজার পৌরাণিক আখ্যানটা বলে দেবেন ক্লাসে।

স্যার, হাবু খাতা দিচ্ছে না।

হরিপদর ডাকে সুধীরবাবু অবাক হন।—কেন?

তা জানি না। বলছে কালকে দেব।

—হাবুল?

হাবু উঠে দাঁড়ায়।

খাতা দিচ্ছ না কেন?

হাবুর মুখে কথা নেই।

—কী, উত্তর দাও।—আজ্ঞে কাল ভালো করে লিখে—

—দেখি খাতাটা —সুধীরবাবু রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

হরিপদ হাবুর রচনা খাতার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেই তিনকড়ি টপ করে ওপরের খাতাখানা তার হাতে তুলে দেয়। হরিপদ সেখানা স্যারের হাতে সমর্পণ করে।

খাতার মলাটে চোখ বুলিয়েই তাঁর কাছে রহস্য পরিষ্কার হয় গোটা গোটা করে লেখা—বীজগণিত খাতা।

ও, এই জন্যে এত ধানাই পানাই! কাল ভালো করে লিখে এনে দেবে। নাঃ, ছেলেটা অতি অগোছালো! তিনি পই পই করে সব্বাইকে বলে দিয়েছেন—একটা আলাদা রচনা খাতা করবে। যা তা খাতায় লিখবে না। দু-সপ্তাহে একটা বাংলা রচনার ক্লাস। তিনি সমস্ত খাতা বাড়ি নিয়ে যান। ভালো করে সংশোধন করে তিন-চার দিন পরে খাতা ফেরত দেন। এবার অবশ্য ফেরত দিতে আরও তিন দিন বেশি দেরি হয়েছিল। শ্রীমান ইতিমধ্যে হোমটাস্ক লিখে বসে আছে। তাড়াতাড়ি লিখেছে খুব ভালো কথা। কিন্তু তা বলে অঙ্ক খাতায় লিখবে? কোনো আলগা কাগজে বা রাফখাতায় লিখতে পারত। তারপর আসল খাতা ফেরত পেলে তাতে টুকে নিত আর হতে পারে হাবুল ওর রচনা খাতাটি হারিয়ে বসে আছে। ফলে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাতেই লিখেছে। ছি ছি একি নোংরামি? আজ তিনি আচ্ছা করে ধুচুনি দেবেন হাবুলকে। ছেলেখেলা পেয়েছে? সুধীরবাবু খাতার পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে হাবুকে বকুনি দেওয়ার জন্যে মনে মনে কড়া কড়া বাক্য ভাঁজতে থাকেন।

এ্যাঁ! এ কী? খাতা শেষ। কিন্তু রচনা কই?

—হরিপদ তুমি ভুল খাতা দিয়েছ, এতে রচনা নেই।

—অ্যাই ঠিক খাতা দে। যেটায় লিখেছিস। হরিপদ হাবুকে তাড়া লাগায়।

তিনকড়ি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—না স্যার। ওই খাতা দেখেই পড়েছে।

হ্যাঁ তাইতো। নীল মলাটে রবিঠাকুরের ছবি ছাপা। তিনি পড়বার সময় লক্ষ করেছিলেন! সুধীরবাবু আর একবার পাতাগুলো সব উলটে দেখেন। নেই!

ব্যাপার কি? ম্যাজিক নাকি? তিনি কী রকম ঘাবড়ে যান। তিনি শুনলেন। ক্লাসের ছেলেরা শুনল—অতবড়ো লেখাটা পড়ল।

—হাবু এই খাতা দেখেই পড়েছ?

হ্যাঁ—হাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

তবে লেখা কই?

হাবু নীরব নিস্পন্দ।—কি? উত্তর দাও।—হাবু চুপ।

তবে কি—সম্ভাবনাটা বিদ্যুতের মতো তাঁর মস্তিকে উদয় হয়। কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য।

তবে কি। মানে তুমি কি লেখোনি? বানিয়ে বানিয়ে বললে?

হ্যাঁ স্যার। ক্ষীণ কণ্ঠে হাবুর উত্তর আসে।

সুধীরবাবু হতভম্ব। তার কুড়ি বছরের মাস্টারি জীবনে এ সমস্যা একেবারে অভিনব। কখনো শোনেননি।

প্রথমেই তার কান গরম হয়ে উঠল রাগে। কী আস্পর্ধা। বেমালুম ঠকাল আমাকে। বেআদব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তাটা মাথায় আসে।

চশমার পুরু কাচের ভিতর থেকে সুধীরবাবুর বড়ো বড়ো চোখ দুটোর স্থির দৃষ্টি হাবুর ওপরে নিবদ্ধ। শুধু হাবু নয়, গোটা ক্লাস কাঠ হয়ে আছে ভয়ে। হাবুর ভবিষ্যৎ ভেবে সবাই আতঙ্কিত। হাবু মনে মনে জপছে — হে ভগবান। যা হয় স্কুলে, বাবার কানে যেন না পৌঁছোয়। হে ভগবান দয়া করো।

তখন সুধীরবাবুর মাথায় ঘুরছে—অদ্ভুত কাণ্ড! অতখানি রচনা স্রেফ বানিয়ে বানিয়ে বলে গেল। আর অমন সুন্দর করে। আশ্চর্য ! সত্যি বলতে কী তাঁর ইচ্ছে করছে নেমে গিয়ে ছেলেটার পিঠ চাপড়ে বলেন—সাবাস।

নাঃ, অতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। ক্লাসে ডিসিপ্লিন রাখা তাহলে শক্ত হয়ে পড়বে। হয়তো এরপর থেকে প্রত্যেক ছেলে না লিখে বানিয়ে বলবার চেষ্টা করবে হাবুর দেখাদেখি। অবশ্য আর কারো ক্ষমতা নেই অমন বানায়। এমন কী ফার্স্টবয় প্রশান্তরও সাধ্য নেই।

থমথমে মুখে গুরুগম্ভীর স্বরে সুধীরবাবু বললেন—

কী? লেখোনি কেন? দু-সপ্তাহের মধ্যে সময় হল না!

আজ্ঞে ভেবেছিলাম কাল সন্ধেবেলা লিখে ফেলব। হাবু মিনমিন করে। কিন্তু গোপালপুরে মেলায় গিয়েছিলাম বিকেলে। ফিরতে রাত হয়ে গেল। এসে দেখি খেতে দিচ্ছে। খেয়ে উঠে পড়া বাবার বারণ তাই—

হুম! তা সোজাসুজি স্বীকার করলেই পারতে? —ভেবেছিলাম করব।— ও তারপর বুঝি বুদ্ধি জাগল? না স্যার! হঠাৎ কেমন গুলিয়ে গেল! আর কখনো হবে না স্যার! হাবুর কণ্ঠে কান্নার আভাস!

বেশ! মনে থাকে যেন! আর কাল আমার রচনা চাই। ঠিক যা যা বললে সব পরিষ্কার করে লিখে আনবে। মনে থাকবে? খাসা বলেছ।

হা তে ক ল মে

অজেয় রায় (১৯৩৭—২০০৮) : শান্তিনিকেতনে বসবাস করতেন। *সন্দেশ*, *কিশোর ভারতী*, *শুকতারা* প্রভৃতি ছোটোদের পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ও দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প লেখায় দক্ষ ছিলেন। বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তাঁর ছিল চাক্ষুষ পরিচয়। সুঅভিনেতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলি হলো *মুঙ্গু*, *কেল্লাপাহাড়ের গুপ্তধন*, *আমাজনের গহনে* ইত্যাদি।

১.১ অজেয় রায়ের লেখা একটি জনপ্রিয় বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তিনি কোন কোন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

২.১ প্রফুল্লর রচনা সুধীরবাবুর কেন পছন্দ হয়নি?

২.২ নিতাই শাস্তি পেল কেন?

২.৩ সুধীরবাবু কোন অন্যায়কে ক্ষমা করেন না?

২.৪ সুধীরবাবুর কপালের ভাঁজ কীসের চিহ্ন?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৩.১ তিনকড়ি হাঁ করে হাবুর খাতার দিকে তাকিয়ে ছিল কেন?

৩.২ ‘ছেলেটা চর্চা রাখলে বড় হয়ে নির্ঘাত সাহিত্যিক হবে।’— ছেলেটি সম্পর্কে এ কথা বলার কারণ কী?

৩.৩ ‘মাঝে মাঝে পাতা উলটিয়ে বলে চলে।’ — পাতা ওল্টানোর কারণ লেখো।

৩.৪ ‘বেমালুম ঠকাল আমাকে’— হাবুল কি সত্যিই মাস্টারমশাইকে ঠকিয়েছিল?

৩.৫ হাবুলের রচনা শুনে সুধীরবাবুর হাবুলকে কী বলার ইচ্ছে হয়েছিল? শেষ পর্যন্ত সেই ইচ্ছে তিনি পূরণ করলেন না কেন?

শব্দার্থ : ভারিক্কি — রাশভারী। কারণ দর্শিয়ে — কারণ দেখাতে বলা। দশাসই — লম্বা চওড়া। মুদ্রাদোষ — ভাবভঙ্গির বা কথা বলার ধরনের অস্বাভাবিক অভ্যাস। মৌলিক — অবিভাজ্য। সন্ধানী — সন্ধানকারী। বিস্ফারিত — বিকশিত, প্রসারিত। পৌরাণিক আখ্যান — পুরাণের গল্প। বেমালুম — বোঝা যায় না এমন।

৪. **নীচের শব্দগুলি থেকে উপসর্গ পৃথক করে, তা ব্যবহার করে নতুন শব্দ তৈরি করো:**

প্রশান্ত, অবহেলা, দুর্ভোগ, অনাবৃষ্টি, বেমালুম।

৫. **'পাল্লা' শব্দটিকে দু'টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে দু'টি বাক্য লেখো।**

৬. **নীচের বাক্যগুলি থেকে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া খুঁজে বের করে ছকের মধ্যে লেখো :**

৬.১ আমি রচনা লিখতে বলেছি।

৬.২ হরিপদ হাবুকে তাড়া লাগায়।

৬.৩ ছেলেরা যে যার রচনা খাতা বের করে ওপরে রাখে।

৬.৪ তিনি ঘড়ি দেখলেন।

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

৭. **বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশকে আলাদা করো :**

৭.১ ভজটা কিছুতেই ছাড়ল না।

৭.২ সুধীরবাবু মন দিয়ে শোনেন।

৭.৩ হাবু শুয়ে কান পেতে শোনে।

৭.৪ দুর্গাপূজার পৌরাণিক আখ্যানটা বলে দেবেন ক্লাসে।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

৮. **ঠিক উত্তরে '✓' চিহ্ন দাও।**

৮.১ হরিপদর ডাকে সুধীরবাবু অবাক হন। (যৌগিক বাক্য/সরল বাক্য)

৮.২ গতকাল তোমার মাকে দেখেছি গোঁসাইবাড়িতে কীর্তন শুনছেন। (জটিল বাক্য/যৌগিক বাক্য)

৮.৩ ফের যদি রচনা আনতে ভুল হয়, তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। (সরল বাক্য/জটিল বাক্য)

৯. **নীচের বাক্যগুলি থেকে অনুসর্গ খুঁজে বের করো এবং নিম্নরেখ পদের বিভক্তি উল্লেখ করো :**

৯.১ <u>বাবার</u> কাছ থেকে চিঠি আনতে হবে।

৯.২ <u>উঠানে</u> কিছু ছেলে খেলছে।

৯.৩ কয়েকজনকে বেছে বেছে পড়তে বলেন।

৯.৪ দে সরকারের রচনার বই থেকে হুবহু টুকে এনেছ।

১০. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

১০.১ স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে হাবুর কী মনে হচ্ছিল?

১০.২ তার চোখে স্কুলের ভেতরের কোন ছবি ধরা পড়ে?

১০.৩ হাবু শেষের দিকের বেঞ্চে বসতে চায় না কেন? সে শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে বসে?

১০.৪ 'এইটাই সুধীরবাবুর মেথড'— সুধীরবাবুর মেথডটি কী? তাঁর এমন মেথড অবলম্বন করার যুক্তিটি কী?

১০.৫ রচনা পড়ার সময় প্রফুল্লকে সুধীরবাবু থামিয়ে দিলেন কেন? তাঁকে তিনি কোন পরামর্শ দিলেন?

১০.৬ 'সুধীরবাবুর একটি মুদ্রাদোষ।'— কী সেই 'মুদ্রাদোষ'? কখনই বা এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল?

১০.৭ 'তবেই রচনায় প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য আসবে।'—সুধীরবাবুর মতে কীভাবে একটি রচনা সাহিত্যিক মূল্যে অনন্য হয়ে ওঠে?

১০.৮ 'শুনছিস? স্রেফ আবোল তাবোল।' —হাবু ওরফে হাবুলচন্দ্রের রচনা পড়াকে প্রশান্তর 'আবোল তাবোল' মনে হয়েছে কেন? তুমি কী এর সঙ্গে একমত?

১০.৯ 'তাঁর কাছে রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল' —কোন রহস্যের কথা বলা হয়েছে? কীভাবে তার জট ছাড়ল?

১০.১০ 'না, এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না।' —কার মনে এমন চিন্তার উদয় হলো? সত্যিই কি তোমার সেই চিন্তাকে বাড়াবাড়ি মনে হয়?

১০.১১ 'তা সোজাসুজি স্বীকার করলেই পারতে' —সুধীরবাবু হাবুকে যে একথা বললেন, সেই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সুযোগ না থাকার জন্য তিনি নিজেই কতখানি দায়ী বলে তোমার মনে হয়?

১০.১২ গল্পে কঠোর মাস্টারমশাই সুধীরবাবুর মধ্যেও এক স্নেহপ্রবণ, নীতিনিষ্ঠ, আদর্শবাদী, প্রশ্রয়দাতা মানুষ লুকিয়ে ছিল— আলোচনা করো।

১১. হাবু শ্রেণিকক্ষে যেভাবে নিজের মনে বানিয়ে চটজলদি রচনা বলে গেছে এমন বলার ক্ষমতা একটা অসাধারণ গুণ। তোমরা খেলার সময় বন্ধুরা টুকরো টুকরো বিষয় নিয়ে এ ব্যাপারে চর্চা করতে পারো।

মিলিয়ে পড়ো

তথাকথিত পরীক্ষা মানেই ভয়, আতঙ্ক, উদ্বেগ।
পাশাপাশি সম্পূর্ণ অন্যরকম পরীক্ষার এই গল্পটি পড়ো।

না পাহারার পরীক্ষা

শঙ্খ ঘোষ

পরীক্ষা দিতে তোমাদের একেবারেই ভালো লাগে না তো? না কি লাগে? আমাদের কিন্তু লাগত না। পড়াশোনা তো ভালোই, তবে পরীক্ষার কথা ভাবলেই হাত-পা কেমন ঠান্ডা হয়ে যেত আমাদের। দুঃস্বপ্ন যেন।

অথচ, সেই আমাদের ছোট্ট স্কুলে, দু-একবার এমনই হলো যে, পরীক্ষাটাও হয়ে উঠল বেশ একটা মজার ব্যাপার।

কীভাবে জানো?

হেডমাস্টারমশাই একবার ক্লাসে এসে বললেন : 'একটা জিনিস কখনও কি ভেবে দেখছ তোমরা? এই যে পরীক্ষার সময়ে হলঘরে মাস্টারমশাইরা ঘুরে বেড়ান গার্ড হয়ে, তোমাদের পক্ষে এটা খুব লজ্জার কথা নয়?'

লজ্জা? লজ্জা কেন? হেডমাস্টারমশাই কি ভয়টাকেই ভুল করে লজ্জা বলছেন? খসখস করে লিখে চলেছে সবাই খাতার পাতায়, আর মাস্টারমশাইরা নিজেদের মধ্যে গুনগুন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘরে, কিংবা বসে আছেন চেয়ারে, আর মাঝেমাঝে হেঁকে উঠছেন 'নো হামিং, নো হামিং' —

ভাবলেই বেশ ভয় হয় না? মাঝে মাঝে মনে হয়, ওখান থেকেই তো আসছে 'হামিং', আমরা আর করছি কতটুকু? কিন্তু সেকথা সাহস করে আর বলে কে! ঘাড় নীচু করে লিখতে লিখতে হয়তো টের পাচ্ছি যে ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন একজন, পড়ে যাচ্ছেন আমার লেখা, তখন কি লিখতে আর কলম সরে? নাঃ, লজ্জার কথা মনে হয়নি কখনও। মাস্টারমশাইরা পাহারাদার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পরীক্ষার ঘরে, এ ছবিটা ভাবলে কেবল ভয়েরই কথা মনে হতো আমাদের।

কিন্তু হেডমাস্টারমশাই আমাদের বোঝালেন যে ভয় নয়, এর মধ্যে আছে একটা লজ্জা। 'কেন তোমাদের পাহারা দিতে হবে? ঘরে যদি কেউ না থাকে তাহলেই কি তোমরা এ ওর দেখে লিখবে? বই খুলে লিখবে? মাস্টারমশাইরা কি কেবল সেইটে ঠেকাবার জন্য বসে থাকবেন ঘরে পুলিশ হয়ে? পরীক্ষার ঘর কি তবে একটা চোর-পুলিশের খেলা? দেখো তো ভেবে? তোমাদের কি এইটুকুও বিশ্বাস করা যাবে না? শুধু সন্দেহই করতে হবে?'

এরকম করে ভাবিনি বটে আগে। কিন্তু এও তো সত্যি যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নানারকম ফন্দি করেই পরীক্ষা দিতে চাইত। টুকরো টুকরো কাগজ বার করত পকেট বা জামার হাতা থেকে, ঝুঁকে পড়ত এ ওর খাতায়। সেইসব ঠেকাবার জন্যই তো ঘুরে বেড়াতে হতো মাস্টারমশাই। লেখা শেষ হলে জমা দিয়ে যাবে খাতা।'

হেডমাস্টারমশাই বললেন : 'তাই ঠিক করেছি যে তোমাদের পরীক্ষার ঘরে পাহারার জন্য পাঠাব না আর কাউকে। খাতা আর প্রশ্নপত্র দিয়ে চলে যাবেন মাস্টারমশাই, ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজেরাই লিখবে তোমরা, লেখা শেষ হলে জমা দিয়ে যাবে খাতা।'

বিহ্বল একটি ছেলে বলে উঠল হঠাৎ : 'কিন্তু কেউ যদি নকল করে সত্যি সত্যি?'

'কেন করবে? আর যদিই বা করে, তাকে কি ভয় দেখিয়ে ঠেকাতে হবে? যদি ধরো তোমাদের ভার তোমাদেরই ওপর দিতে চাই, নেবে না সে-ভার? কাজটা যে ভালো নয়, এটা যদি তোমরা বুঝতে পারো, সে-কাজ নিশ্চয় নিজে থেকেই বন্ধ করবে তোমরা? আর, ভালো নয় বুঝেও কাজটা যদি করে কেউ, তাহলে সে তা করবে। পুলিশি করে ঠেকাতে চাই না তা। কী, রাজি তো সবাই? নিজের ভার নিজে নিতে?'

কী আশ্চর্য, আমরা কেন রাজি থাকব না? ঘরে থাকবেন না কেউ আর আমরা দেব পরীক্ষা, আমাদের এতে অরাজি হওয়ার তো কথাটি ওঠে না মোটে। কিন্তু মাস্টারমশাইরা রাজি হবেন তো?

ফুর্তির একটা ঢেউ উঠল গোটা ইস্কুল জুড়ে। ইনভিজিলেটর থাকবে না কেউ, পরীক্ষা দেব নিজেরা নিজেরা! আঃ, ভারি একটা নতুনরকমের কাণ্ড হবে।

তারপর একদিন এসে গেল পরীক্ষা। ভিন্নরকম একটা উত্তেজনা হচ্ছে আমাদের। আমাদের বিশ্বাস করা হচ্ছে, আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেই বিশ্বাসের সেই দায়িত্বের একটা মর্যাদা দিতে হবে— অন্য মাস্টারমশাইরাও কদিন ধরে বুঝিয়ে বলছেন সেই কথা। মর্যাদা দেবারই ভঙ্গি নিয়ে ক্লাসঘরে গিয়ে বসেছি আমরা, খাতা দিয়ে প্রশ্ন দিয়ে চলে গেছেন মাস্টারমশাই, কলম খুলে শুরু করেছি লেখা।

স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে যে ছেলেটি, সবচেয়ে না-পড়ুয়া, দুষ্টুবুদ্ধিতে ভরাট, ধরা যাক 'হৃদয়' তার নাম , সে বসেছে একেবারে পিছনের বেঞ্চে। তার বসা দেখে সবাই বুঝে নিয়েছে যে নিরিবিলি আপনমনে তার নকল করা আজ ঠেকাতে পারবে না কেউ। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই তো বলেই দিয়েছেন যে চানও না তিনি ঠেকাতে, নকল যদি কেউ করতে চায় তো করুক, সে তার নিজের দায়িত্ব। তাই ও নিয়ে আর ভাবছিলাম না আমরা। আত্মমর্যাদায় গরীয়ান হয়ে লিখে যাচ্ছিলাম সবাই।

কেটে গেছে বেশ খানিকটা সময়। হঠাৎ চমকে উঠি পিছন থেকে একটা তর্জন শুনে: 'অ্যাই, ঘাড় ঘোরাচ্ছিস কেন? লিখে যা নিজের মতো। ইঃ ঘাড় ঘোরাচ্ছে!'

সবাই একসঙ্গে পিছন ফিরে দেখি, কথাটা বলছে হৃদয়। বলছে: 'ভেবেছিস তোদের দেখবার কেউ নেই? আমি আছি। আমি তো আর লিখতে পারব না কিছু, পড়ে তো আসিনি, তাই আমিই তোদের দেখব। লেখ মন দিয়ে—'

ঘাড় যে ঘোরাচ্ছিল তার কোনো অভিসন্ধি ছিল না, একটু হেসে সে আবার শুরু করল লেখা, শুরু করলাম আমরাও। ঘণ্টা পড়ে গেলে সকলের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও জমা দিল তার ফাঁকা খাতা। কিন্তু সেই ফাঁকা খাতা, সেই শূন্য খাতাই সেদিন যেন হয়ে উঠল হেডমাস্টারমশাইয়ের মস্ত এক জয়তিলক, আমাদেরও।

না বললেও চলে, বুঝতেই পারছ, সেই ছোট্ট পরীক্ষাটাতে পাশ করেনি হৃদয়। কিন্তু অল্প কিছুদিন পড়াশোনা করে, বেশ ভালোভাবেই সে টপ্‌কে গেল ইস্কুলের শেষ পরীক্ষা। আমাদের সেই শেষ পরীক্ষা দিতে হয়েছিল অন্য এক শহরে গিয়ে, নাটোরে। পরীক্ষায় পাহারা দিতে দিতে সেখানকার শিক্ষক-প্রহরীরা যখন বলছিলেন, 'এ-ঘরে তো না থাকলেও চলে দেখি, এরা তো মুখও তোলে না', ইস্কুলের ছেলেরা তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল মর্যাদাভরা খুশিতে, সেই আমাদের ছোট্ট স্কুলের ছোট্ট একটা মর্যাদায়।

কিশোর বিজ্ঞানী

অন্নদাশঙ্কর রায়

এক যে ছিল কিশোর, তার
মন লাগে না খেলায়
ছুটি পেলেই যায় সে ছুটে
সমুদ্দুরের বেলায়।

সেখানে সে বেড়ায় হেঁটে
এধার থেকে ওধার
বাড়ি ফেরার নাম করে না
হোক না যত আঁধার।

কুড়িয়ে তোলে নানা রঙের
নকশা আঁকা ঝিনুক
এক একটি রতন যেন
নাই বা কেউ চিনুক।

বড়ো হয়ে ঝিনুক কুড়োয়
জ্ঞানের সাগরবেলায়।
ঝিনুক তো নয়, বিদ্যা রতন
মাড়িয়ে না যায় হেলায়।

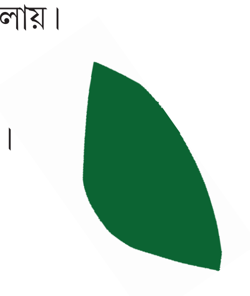

বৃদ্ধ এখন, সুধায় লোকে,
'কী আপনার বাণী।
বলে গেছেন যা নিউটন
পরম বিজ্ঞানী—

'অনন্তপার জ্ঞান পারাবার
রত্নভরা পুরী
তারই বেলায় কুড়িয়ে গেলেম
কয়েক মুঠি নুড়ি।'

হাতে কলমে

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪—২০০২) : জন্ম ওড়িশার ঢেঙ্কানলে। প্রথম জীবনে ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও পরবর্তী জীবনে বাংলাভাষায় বহু মননশীল উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *তারুণ্য*। তাঁর লেখা অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে পথে *প্রবাসে*, *সত্যাসত্য*, *যার যেথা দেশ* প্রভৃতি। তাঁর লেখা *উড়কি ধানের মুড়কি*, *রাঙা ধানের খই* প্রভৃতি ছড়ার বই ছোটোদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। অন্নদাশংকর রায় লীলাময় রায় ছদ্মনামেও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১.১ অন্নদাশংকর রায় প্রথম জীবনে কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করতেন?

১.২ তাঁর লেখা দুটি ছোটোদের ছড়ার বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ কিশোরের মন লাগেনা কীসে?

২.২ কখন কিশোর মন সমুদ্দুরের বেলায় যেতে চায়?

২.৩ অনুসন্ধিৎসু কিশোরটি সাগরবেলায় কী কুড়িয়ে তোলে?

২.৪ কোন পারাবারকে ‘অনন্তপার’ বলা হয়েছে?

২.৫ দুজন প্রখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানীর নাম লেখ।

শব্দার্থ : নকশা — স্কেচ, রেখাচিত্র। মাড়িয়ে — পায়ে দলে। সুধায় — অমৃতে। অনন্তপার — অন্তহীন মহাবিশ্ব। জ্ঞান পারাবার — জ্ঞানের সমুদ্র।

৩. **কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো :** আলো, ছোটো, এখানে, তখন।

৪. **প্রতিটি শব্দকে পৃথক অর্থে আলাদা বাক্যে প্রয়োগ করো :** সুধায়, পুরী, বেলা, হেলা, ভরা।

৫. **আবিষ্কারের গল্পগুলির পাশে পাশে আবিষ্কারকের নাম উল্লেখ করো এবং তাঁদের সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করো :** ঘড়ি, এরোপ্লেন, রেডিও, দূরবীন, টেলিভিশন।

৬. ছুটি পেলে তোমার মন কী করতে চায় পাঁচটি বাক্যে লেখো।

৭. **কবিতা থেকে শব্দ নিয়ে নীচের শব্দছকটি পূরণ করো :**

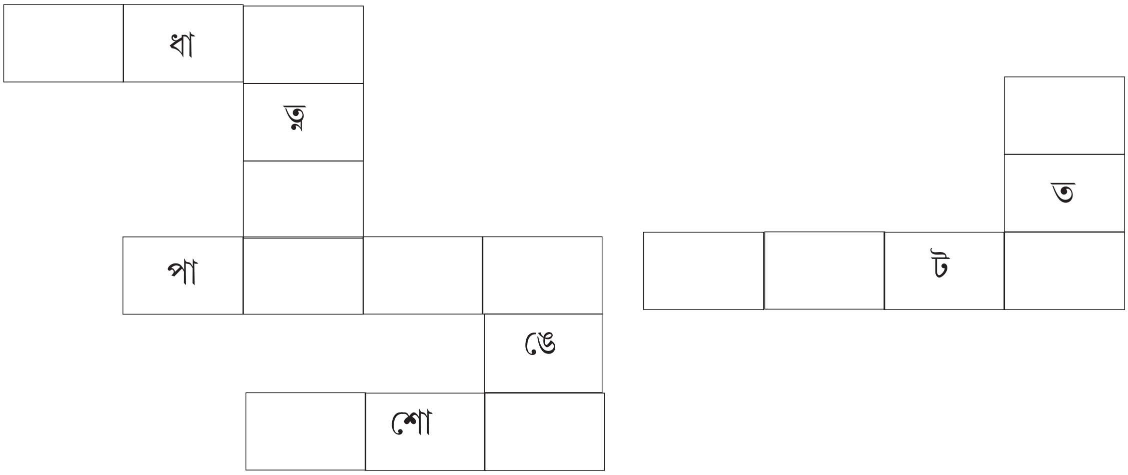

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৮.১ পাঠ্য ছড়াটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটি শুরু হয়েছে 'এক যে ছিল কিশোর...' — এইভাবে। সাধারণত কোন ধরনের রচনা এভাবে শুরু হয়ে থাকে? সেই ধরনের রচনার বিষয়ের সঙ্গে ছড়াটির বিষয়গত সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো।

৮.২ 'মন লাগে না খেলায়' — কার খেলায় 'মন লাগে না'? কিশোরেরা সাধারণত কোন ধরনের খেলাধুলো করে থাকে? তার পরিবর্তে ছড়ার কিশোরটি কী করতে পছন্দ করত?

৮.৩ 'এক একটি রতন যেন/নাই বা কেউ চিনুক।' — কোন জিনিসকে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? কেনই বা এ ধরনের তুলনা? তাকে চেনা বা না চেনার প্রসঙ্গই বা এল কেন?

৮.৪ সেদিনের কিশোরটি পরিণত বয়সে উপনীত হলে তাকে কী করতে দেখা যায়?

৮.৫ 'ঝিনুক কুড়োয়/জ্ঞানের সাগরবেলায়' — অংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৮.৬ 'বৃদ্ধ এখন, সুধায় লোকে' — কে এখন 'বৃদ্ধ'? লোকে তাকে কী জিজ্ঞেস করে? তাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কী বলেন?

৮.৭ কোন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর প্রসঙ্গ ছড়াটিতে রয়েছে? বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

ননীদা নট আউট

মতি নন্দী

রুপোলি সংঘের সঙ্গে সি সি এইচ-এর হাড্ডাহাড্ডির শুরু পঁচিশ বছর আগে শনিবারের একটা ফ্রেন্ডলি হাফ-ডে খেলা থেকে। ননীদা এমন এক ননীটিকস প্রয়োগ করে ম্যাচটিকে ড্র করান, যার ফলে এগারো বছর রুপোলি সংঘ আমাদের সঙ্গে আর খেলেনি। গল্পটা শুনেছি মোনা চৌধুরির (অধুনা মৃত) কাছে। মোনাদা এ খেলায় ক্যাপ্টেন ছিলেন। উনি না বললে, এটাকে শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা গল্প বলেই ধরে নিতাম।

সি সি এইচ প্রথম ব্যাট করে ১৪ রানে সব আউট হয়ে যায়। মোনাদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ড্রেসিংরুমে। সবারই মুখ থমথম। এক ওভার কি দু-ওভারেই রুপোলি সংঘ রানটা তুলে নেবে। ওদের ড্রেসিংরুম থেকে নানান ঠাট্টা এদিকে পাঠানো হচ্ছে। কটা বলের মধ্যে খেলা শেষ হবে তাই নিয়ে বাজি ধরছে। রুপোলির ক্যাপ্টেন এসে বলল, 'মোনা, আমরা সেকেন্ড ইনিংস খেলে জিততে চাই, রাজি?' মোনাদা জবাব দেবার আগেই ননীদা বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় আমরা খেলব। তবে ফার্স্ট ইনিংস আগে শেষ হোক তো!'

সবাই অবাক হয়ে তাকল ননীদার দিকে। রুপোলির ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে, 'তাই নাকি?' বলে চলে গেল। ননীদা বললেন, 'এ ম্যাচ রুপোলি জিততে পারবে না। তবে আমি যা বলব তাই করতে হবে।"

মোনাদা খুবই অপমানিত বোধ করছিলেন রুপোলির ক্যাপ্টেনের কথায়, তাই রাজি হয়ে গেলেন। তখন বিষ্টুকে একধারে ডেকে নিয়ে ননীদা তাকে কী সব বোঝাতে শুরু করলেন আর বিষ্টু শুধু ঘাড় নেড়ে যেতে থাকলো। তিরিশ মাইল রোডরেসে বিষ্টু পর পর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন। শুধু ফিলডিংয়ের জন্যই ওকে মাঝে মাঝে দলে নেওয়া হয়। ব্যাট চালায় গাঁইতির মতো, তাতে অনেক সময় একটা-দুটো ছক্কা উঠে আসে।

রুপোলি ব্যাট করতে নামল। ননীদা প্রথম ওভার নিজে বল করতে এলেন। প্রথম বলটা লেগস্টাম্পের এত বাইরে যে, ওয়াইড সংকেত দেখাল লেগ আম্পায়ার। দ্বিতীয় বলে ননীদার মাথার দশ হাত উপর দিয়ে ছয়। তৃতীয় বল পয়েন্ট দিয়ে চার। পরের দুটি বলে, আশ্চর্য রকমের ফিল্ডিংয়ে কোনো রান হলো না। শেষ বলেই লেগবাই। বিষ্টু লং অন থেকে ডিপ ফাইন লেগে যেভাবে দৌড়ে এসে বল ধরে, তাতে নাকি রোম ওলিম্পিকের ১০০ মিটারে সোনার মেডেল পাওয়া যেত। তা না পেলেও বিষ্টু নির্ঘাত বাউন্ডারি বাঁচিয়ে যখন উইকেটকিপারকে বল ছুড়ে দিল, রুপোলির দুই ব্যাটসম্যান তখন তিনটি রান শেষ করে হাঁফাচ্ছে।

ওভার শেষ। স্কোর এখন সমান-সমান। দু-দলেরই ১৪। বিষণ্ণতায় সি সি এইচ-এর সকলের মুখ ম্লান। শুধু ননীদার মুখে কোনো বিকার নেই। সাধারণত অতুল মুখুজ্জেই এরপর বল করে। সে এগিয়ে আসছে কিন্তু হাত তুলে নিষেধ করে ননীদা বলটা দিলেন বিষ্টুর হাতে। সবাই অবাক। বিষ্টু তো জীবনে বল করেনি! কিন্তু কথা দেওয়া হয়েছে, ননীদা যা বলবেন তাই করতে হবে। বিষ্টু গুনে গুনে ছাব্বিশ কদম গিয়ে মাটিতে বুটের ডগা দিয়ে বোলিং মার্ক কাটল। ব্যাটসম্যান খেলার জন্য তৈরি। বিষ্টু তারপর উইকেটের দিকে ছুটতে শুরু করল।

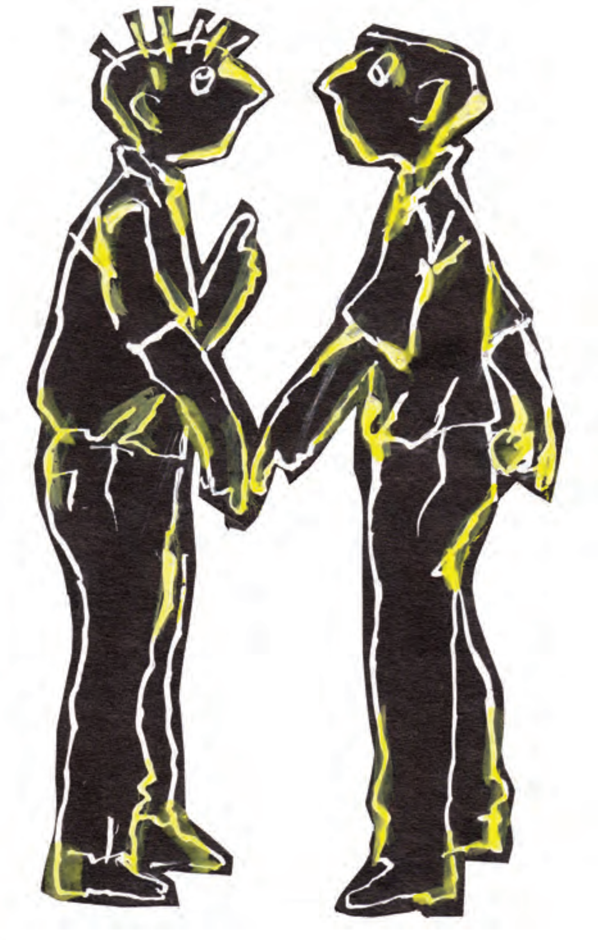

বোলিং ক্রিজে পৌঁছোবার আগে অদ্ভুত এক কান্ড ঘটল। বিষ্টু আবার পিছু হটতে শুরু করেছে। তারপর গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল। সারা মাঠ অবাক, শুধু ননীদা ছাড়া।

বিষ্টু কি পাগল হয়ে গেলো? ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, ঘুরছে আবার পাক খাচ্ছে, লাফাচ্ছে, বোলিং মার্কে ফিরে যাচ্ছে, ডাইনে যাচ্ছে, বাঁয়ে যাচ্ছে কিন্তু বল হাতেই রয়েছে।

‘এ কী ব্যাপার!’ রুপোলির ব্যাটসম্যান কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, ‘বোলার এভাবে ছুটোছুটি করছে কেন?’

ননীদা গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘বল করতে আসছে।’

‘এসে পৌঁছবে কখন?’

‘পাঁচটার পর। যখন খেলা শেষ হয়ে যাবে।’

এরপরই আম্পায়ারকে ঘিরে তর্কাতর্কি শুরু হলো। ননীদা যেন তৈরিই ছিলেন, ফস করে পকেট থেকে ক্রিকেট আইনের বই বের করে দেখিয়ে দিলেন, বোলার কতখানি দূরত্ব ছুটে এসে বল করবে, সে সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। সারাদিন সে ছুটতে পারে বল ডেলিভারির আগে পর্যন্ত।

বিষ্টু যা করছিল তাই করে যেতে লাগল। ব্যাটসম্যান ক্রিজ ছাড়তে ভরসা পাচ্ছে না, যদি তখন বোল্ড করে দেয়! ফিল্ডাররা কেউ শুয়ে, কেউ বসে। ননীদা মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন আর হিসেব করে বিষ্টুকে চেঁচিয়ে বলছেন, ‘আর দেড় ঘণ্টা!’ ... ‘আরও এক ঘণ্টা!’... ‘মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট’!

কথা আছে পাঁচটায় খেলা শেষ হবে। পাঁচটা বাজতে পাঁচে নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হলো। বল ডেলিভারি দিতে বোলার ছুটছে, তার মাঝেই খেলা শেষ করা যায় কিনা? দুই আম্পায়ার আলোচনা করে ঠিক করলেন, তা হলে সেটা বেআইনি হবে।

সুতরাং বিষ্টুর পাক দিয়ে দিয়ে দৌড়োনো বন্ধ হলো না। মাঠের ধারে লোক জমেছে। তাদের অনেকে বাড়ি চলে গেল। অনেক লোক খবর পেয়ে দেখতে এল। ব্যাটসম্যান সান্ত্রীর মতো উইকেট পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যা নামল। বিষ্টু ছুটেই চলেছে। চাঁদ উঠল আকাশে। ফিল্ডাররা শুয়েছিল মাটিতে। ননীদা তাদের তুলে ছজনকে উইকেটকিপারের পিছনে দাঁড় করালেন, বাই রান বাঁচাবার জন্য। এরপর বিষ্টু বল ডেলিভারি দিল।

রুপোলির ব্যাটসম্যান অন্ধকারে ব্যাট চালাল এবং ফসকাল। সেকেন্ড স্লিপের পেটে লেগে বলটা জমে গেল। ননীদা চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘ম্যাচ ড্র।’

রুপোলির ব্যাটসম্যান প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, বল ডেলিভারির মাঝে যদি খেলা শেষ করা না যায়, তাহলে ওভারের মাঝেও খেলা শেষ করা যাবে না। শুরু হলো তর্কাতর্কি। বিষ্টুকে আরও পাঁচটা বল করে ওভার শেষ করতে হলে, জেতার জন্য রুপোলি একটা রান করে ফেলবেই — বাই, লেগবাই, ওয়াইড যেভাবেই হোক। কিন্তু ননীদাকে দমানো সহজ কথা নয়। ফস করে তিনি আলোর অভাবের আপিল করে বসলেন। চটপট মঞ্জুর হয়ে গেল।

আমার ধারণা, মোনাদা কিছুটা রং ফলিয়ে আমাকে গল্পটা বলেছেন। আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তগুলো, ফ্রেন্ডলি ম্যাচে হলেও, ঠিক হয়েছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ননীদাকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জানে, তারা কেউ এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে খুব বেশি প্রশ্ন তুলবে না।

হাতেকলমে

মতি নন্দী (১৯৩৩ — ২০১০) : জন্মস্থান কলকাতা। কিশোর বয়স থেকেই খেলাধূলার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। একটি বিখ্যাত দৈনিকের ক্রীড়া বিভাগের সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই বিভাগের সম্পাদক হয়েছিলেন। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, সাঁতার ইত্যাদি প্রায় সবধরনের খেলা নিয়ে তিনি অসামান্য সব গল্প উপন্যাস লিখেছেন। ক্রিকেটের একচ্ছত্র সম্রাট স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের জীবনকথা বাংলাভাষায় লিখেছেন মতি নন্দী। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে *ননীদা নট আউট, কোনি, স্ট্রাইকার, স্টপার, কলাবতী, অপরাজিত আনন্দ, জীবন অনন্ত* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খেলার বিষয় বাদ দিয়েও তিনি অন্যান্য অনেক গল্প এবং উপন্যাসও লিখেছেন। *সাদা খাম* নামক উপন্যাসের জন্য তিনি *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার পেয়েছিলেন। পাঠ্য রচনাটি তাঁর *ননীদা নটআউট* মূলগ্রন্থটির অংশবিশেষ।

১.১ মতি নন্দীর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তিনি কোন ক্রিকেটারের জীবনকথা লিখেছেন?

২. **নীচের শব্দগুলির বর্ণ বিশ্লেষণ করে মৌলিক ও যৌগিক বর্ণগুলিকে ছকের ঠিক ঠিক ঘরে বসাও :**
তৈরি, পৌঁছোবার, দৌড়ানো, চৌধুরি।

শব্দ	বর্ণ-বিশ্লেষণ	মৌলিক শব্দ	যৌগিক শব্দ

৩. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করে লেখো :**
খেলা, জবাব, অপমানিত, বিষণ্ণতা, উদ্ভব।

৪. **চার, পাঁচ, এগারো, পঁচিশ, তিরিশ** — এই শব্দগুলিকে ব্যাকরণগতভাবে আমরা কী বলি? এদের পূরণবাচক রূপটি লেখো।

৫. **নীচের শব্দগুলি থেকে উপসর্গ পৃথক করে দেখাও এবং তা দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে লেখো।**
প্রতিশব্দ, হাফ-ডে, অতুল, বেফিকির।

৬. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৬.১ রুপোলি সংঘের সঙ্গে কাদের খেলা হয়েছিল?

৬.২ খেলাটিতে ক্যাপ্টেন কে ছিলেন?

৬.৩ সি সি এইচ-এর খেলোয়াড়দের মুখ ম্লান হয়েছিল কেন?

৬.৪ বোলিং ক্রিজে পৌঁছোবার আগে বিষ্টু কী কাণ্ড করেছিল?

৬.৫ ব্যাটসম্যান ক্রিজ ছাড়ছিল না কেন?

৬.৬ ফিল্ডাররা মাঠে কী করছিল?

৬.৭ সবার মুখ যখন ম্লান তখন ননীদার মুখে কোনো বিকার ছিল না কেন?

শব্দার্থ : অধুনা — সম্প্রতি। তর্কাতর্কি — বচসা। উদ্ভব — উৎপত্তি। মঞ্জুর — অনুমোদিত।

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৭.১ 'এটাকে শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা গল্প বলেই ধরে নিতাম।' — বক্তার এহেন মন্তব্যের কারণ কী? শিবরামের গল্পের কোন বিশেষত্বের গুণে তাঁর এমন মন্তব্য?

৭.২ 'সারা মাঠ অবাক, শুধু ননীদা ছাড়া।' — সারা মাঠকে অবাক করে দেওয়ার মতো কোন ঘটনা ঘটেছিল? ননীদা সে ঘটনায় অবাক হলেন না কেন?

৭.৩ 'যখন খেলা শেষ হয়ে যাবে।' — খেলা শেষের পর কোন ঘটনা ঘটবে?

৭.৪ 'ক্রিকেটে আইনের বই বার করে দেখিয়ে দিলেন...' — তোমার জানা ক্রিকেটের কিছু আইন যোগ করো। সঙ্গে অন্য কোনো ঘরের/বাইরের খেলার আইনকানুনও যোগ করতে পারো।

৭.৫ 'আম্পায়ারকে ঘিরে তর্কাতর্কি শুরু হলো।' — আম্পায়ারকে ঘিরে তর্কাতর্কি শুরু হয়েছিল কেন? মাঠে চূড়ান্ত অস্থিরতার সময় ননীদা কেমন ভূমিকা নিলেন?

৭.৬ 'নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হলো।' — উদ্ভূত নতুন সমস্যাটি বা কী?

৭.৭ 'এরপর বিষ্টু বল ডেলিভারি দিলো।' — বল ডেলিভারির আগে বিষ্টু যা যা ঘটনা ঘটায় তা বিবৃত করো।

৭.৮ 'চটপট মঞ্জুর হয়ে গেল।' — কোন আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল? আবেদনকারী কে ছিলেন? তার এমন আবেদনের কারণ কী ছিল?

৭.৯ 'তারা কেউ এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে খুব বেশি প্রশ্ন তুলবে না।' — কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে? সে ঘটনা সত্যাসত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কেন বলে বক্তার মনে হয়েছে? পাঠ্যাংশটি পড়ে তোমার মনে জাগা প্রশ্নগুলি লেখো।

৮. ক্রিকেট মাঠে খেলোয়াড়দের দাঁড়ানোর বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি নীচের জায়গাটিতে নির্দেশ করো।

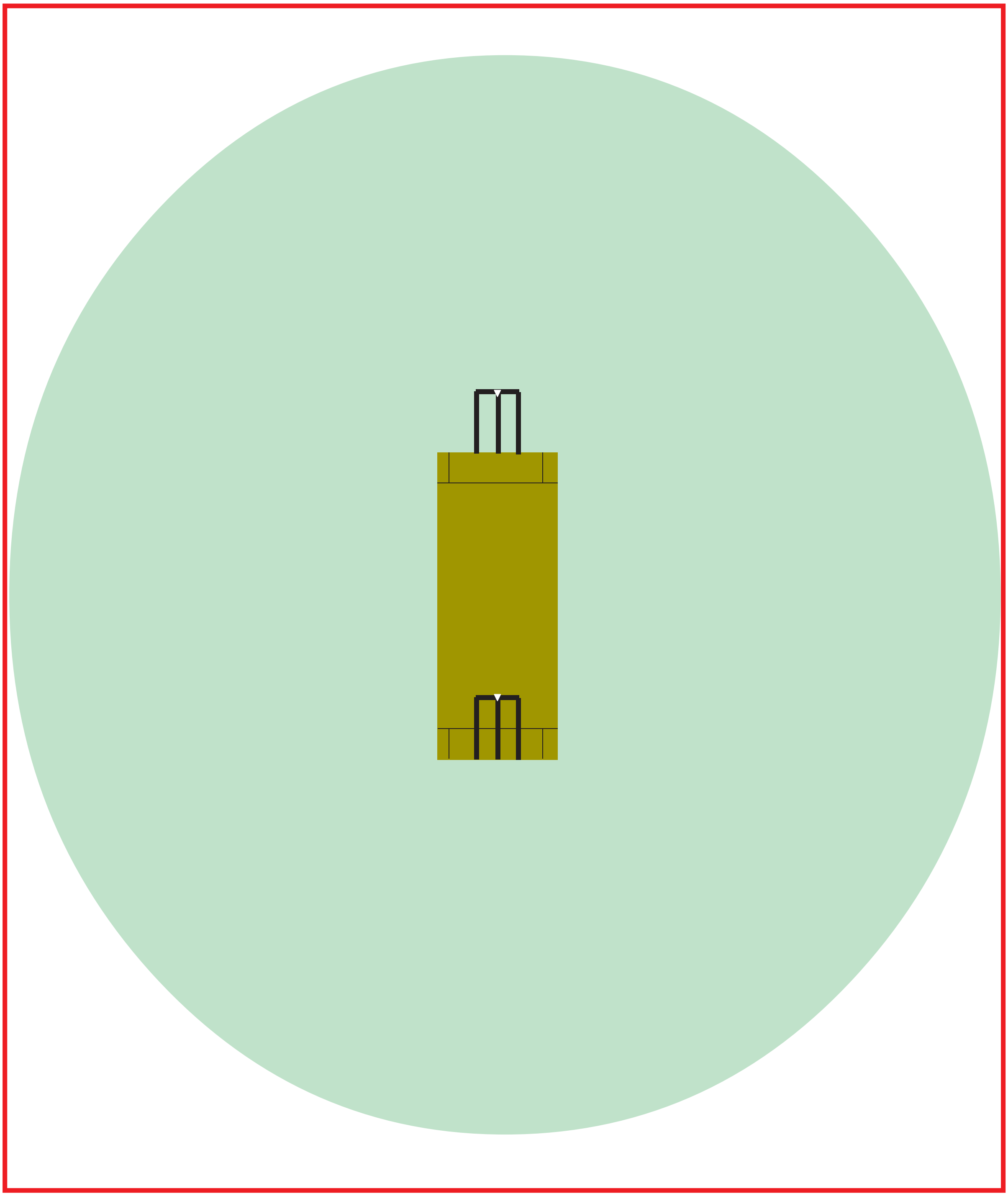

২

বই পড়ার কায়দা কানুন

বই পড়ে কত কিছু জানা যায় তার শেষ নেই। যা জানতে চাই তার জন্য ঠিক বইটা খুঁজে নিতে হবে। আর চিনে নিতে হবে তার কয়েকটা অংশ। জানতে হবে কোন বই থেকে কী জানা যাবে। আগে চিনে নিই বই-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ :

প্রচ্ছদ, জ্যাকেট ও ব্লার্ব : শক্ত বোর্ডের বইকে ঢেকে রাখে একটা মলাট যার খানিক অংশ মুড়ে যায় ঐ বোর্ডের ভিতর দিকে। একে বলে **জ্যাকেট**। ওপরে থাকে বই-এর **প্রচ্ছদ** যাতে বই-এর নাম, লেখকের নাম থাকে। আর ভেতর দিকে মুড়ে থাকা অংশে থাকে বই আর লেখক সম্পর্কে কিছুটা পরিচিতি। এই পরিচিতি অংশকে বলে **ব্লার্ব**, যার থেকে বইটা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় অর্থাৎ বইটা কী নিয়ে লেখা তা বোঝা যায়।

আখ্যাপত্র ও প্রকাশক : বইটি যে বা যারা ছেপে প্রস্তুত করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাঁকে বা তাঁদেরকে সাধারণভাবে প্রকাশক বলে। বই-এর **আখ্যাপত্র** বা Title page এর নীচের দিকে থাকে প্রকাশকের নাম। বই ভালো কিনা তা ভালো প্রকাশকের ওপরে নির্ভর করে।

সূচিপত্র : বই-এর আখ্যাপত্রের পরে সূচিপত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বইটাতে কী কী লেখা আছে, কার পরে কী আছে এবং কতটা বেশি বা কম আছে তার বিবরণ থাকে সূচিপত্রে। **সূচিপত্র** দেখে আমরা বুঝতে পারি আমি যতটা জানতে চাইছি বইতে ততটা আছে কিনা।

এর পরে থাকে বই-এর মূল অংশ যেখানে বইটি যে বিষয় নিয়ে লেখা তা পরপর কতকগুলো নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে এমনভাবে সাজানো থাকে যে পড়লেই পুরো বিষয়টা বোঝা যায়। এই ভাগগুলোকে বলে **অধ্যায় বা চ্যাপ্টার** (chapter)। অনেক সময় অধ্যায়গুলোর আলাদা আলাদা নাম থাকে, কখনো বা এক, দুই, তিন এভাবে সাজানো থাকে। বই-এর আরো কিছু অংশ থাকে যেমন **ভূমিকা , উৎসর্গপত্র, পাদটীকা, উল্লেখপঞ্জি, সূত্রনির্দেশ, নির্ঘণ্ট , ভুল সংশোধন** ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কেও তোমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারো।

এবার আসি নানা রকমের বই-এর কথায়। বাঁধাই হিসাবে বই হয় দু-রকম— বোর্ড বাঁধাই আর পেপারব্যাক। যাতে সব মানুষ বই কিনতে পারেন সে জন্য বই-এর দাম কম রাখার উদ্দেশ্যে একই বই পেপারব্যাক সংস্করণ হিসাবে প্রকাশ করা হয় কারণ পেপারব্যাক সংস্করণের পাতা বা ছাপা কিছুটা সাধারণ মানের হয়। বোর্ড বাঁধাই অনেক বেশি টেকসই হয় কারণ তাতে ভালো পাতা, ভালো ছাপা যেমন থাকে তেমনি তার বাঁধাই খুব ভালো হয়, ফলে সহজে ছেঁড়ে না।

তার নাম ছায়াময়। হয় সে মানুষ, নয় সে শিমুলগড়ের পুরনো ভূত। তবে, মানতেই হবে, সে যদি মানুষ হয়, খুব মহৎ মানুষ। আর যদি ভূত হয়, খুব উপকারী ভূত ছায়াময়। নইলে কি আর অলঙ্কার খুঁজে পেত ইন্দ্রকে ? সেই তো যোগাযোগটা ঘটিয়ে দিলে। আর তাইতেই তো সার্থক হল ইন্দ্রর সেই সুদূর বিলেত থেকে রায়দিঘিতে ছুটে আসা।
তোমরা হয়তো ভাবছ, কে ইন্দ্র আর কে অলঙ্কার, সেটাই তো জানা হল না। জানবে, জানবে। কেন-যে শিমুলগড়ে রাতারাতি শোরগোল পড়ে গেল খুন আর চোরাই মোহর নিয়ে, কেন-যে কাপালিক কালী বিশ্বাসকে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে চুপ করিয়ে দিতে চায় গগন সাঁপুই, কেন-যে লক্ষ্মণ পাইক শুধু এমন লোক খুঁজে বেড়ায় যার দুটো হাতই বাঁ-হাত কিংবা দন্ত্য ন দিয়ে নামের শুরু—এই সমস্ত কথা জানবে। মজায়, চমকে, রহস্যে ভরপুর এই দুর্দান্ত উপন্যাসে।

ব্লার্ব

আমরা যত ধরনের বই ব্যবহার করি তাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় **সাধারণ বই** আর **আকরগ্রন্থ বা রেফারেন্স বই**। তোমাদের পাঠ্য বই বা গল্প, কবিতা নাটকের বই এগুলোকে সাধারণ বই -এর ভাগে রাখা যায়। আকরগ্রন্থ বা রেফারেন্স বই কিন্তু একেবারে আলাদা। নির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানতে রেফারেন্স বই ব্যবহার করতে হয়। যেমন ধরা যাক কেউ জানতে চাইল 'ঋক্ষ' শব্দের অর্থ কী ? আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলি **বাংলা অভিধান** দেখতে। অভিধান এক ধরনের রেফারেন্স বই আ আকরগ্রন্থ। অভিধান একবার দেখতে শিখলে আর পড়ায় কোনো বাধা থাকে না। যে কোনো অজানা শব্দের মানে বুঝতে পারলেই বেশ ঝরঝর করে পড়া যায়। অভিধান দেখাও খুব সহজ। ঠিক যেমন করে আমরা বর্ণমালায় *অ-আ-ই-ঈ* পাই তেমনি অভিধানে *অ*-দিয়ে শব্দ আগে সাজানো থাকবে, তারপরে আসবে *আ*-দিয়ে শব্দগুলো। *অ*-দিয়ে যত শব্দ আছে সেগুলোও কিন্তু ঐ একই নিয়মে *অ*-এর মধ্যে সাজানো থাকবে। এভাবে *অ* থেকে *হ* পর্যন্ত যত শব্দ আছে সবগুলো পরপর থাকবে আর পাশে থাকবে শব্দের অর্থ। এই রকম শব্দ সাজানোর পদ্ধতিকে বলে **বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস**। প্রতি ভাষার অভিধান আছে। বাংলা থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরাজি, ইংরাজি থেকে বাংলা, ইংরাজি থেকে ইংরাজি। আবার এক

ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তরজমার অভিধানও আছে। যেমন ফরাসি থেকে জার্মান, উর্দু থেকে বাংলা। নানারকম ভাষার আলাদা অভিধান পাওয়া যায়। এছাড়াও সাহিত্যাভিধান, ইতিহাস অভিধান, ব্যাকরণ অভিধান প্রভৃতি নানা ধরনের অভিধানও হয়।

রেফারেন্স বই কিন্তু টানা পড়া হয় না, যখন দরকার হয়, তখনই এর ব্যবহার। কিন্তু সাধারণ বই আমরা টানা পড়তে পারি। কেবল একটা শব্দের মানে দেখার জন্যেই অভিধান দেখার দরকার হতে পারে কিন্তু আমরা কি কেউ কখনো গল্পের এক লাইন পড়ে পড়া বন্ধ করি? তাছাড়া রেফারেন্স বই একটা নির্দিষ্ট ধরনে সাজানো থাকে কিন্তু সাধারণ বই বিষয় ধরে বা গল্পের মতো টানা লেখা হয়। অভিধান ছাড়াও আরো অনেক রকমের আকরগ্রন্থ বা রেফারেন্স বই আছে যেমন অ্যাটলাস বা মানচিত্র—যা থেকে কোন জায়গা ঠিক কেমন দেখতে আর পৃথিবীর বুকে সে ঠিক কোন জায়গায় আছে তা জানা যায়। কোনো বড়ো মানুষের জীবনী জানতে গেলে জীবনী জাতীয় কোনো রেফারেন্স বই, আবার কোথাও বেড়াতে যেতে চাইলে সেই জায়গা সম্পর্কে জানতে লাগে **গাইড বই বা সন্ধান বই** জাতীয় আকরগ্রন্থ। তাহলে এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে কোনো বিষয় আমাদের পাঠ্যবই-এর পাশাপাশি রেফারেন্স বই বলে যে অন্যান্য বই-এর তালিকা দেওয়া হয় তা কিন্তু বই পড়ার সাবেক কায়দাকানুন মতে রেফারেন্স বই নয়।

আবার পত্রিকা বা ম্যাগাজিন বের হয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর যেমন প্রতি সপ্তাহে, প্রতি পনেরো দিন অন্তর, বা প্রতি মাসে। যতদিন অন্তর বের হয় সে অনুসারে পত্রিকাগুলোকে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক মাসিক এইরকম সব নামে ডাকা হয়। অনেক আগে কতগুলি বিখ্যাত পত্রিকা শুধু ছোটোদের জন্য প্রকাশিত হতো যেমন *শিশুসাথী*, *মৌচাক*, *রংমশাল*। তা ছাড়া কেবলমাত্র একটি বিষয় নিয়েও পত্রিকা বের হতে পারে, যেমন খেলাধূলা বা বিজ্ঞান নিয়ে পত্রিকার সংখ্যা অনেক। বড়োদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় যেমন ধরো ইতিহাস, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে যে সব পত্রিকা বের হয় তার মধ্যে এই সব বিষয়ে নতুন নতুন যেসব ধারণার খোঁজ পাওয়া যায় বা আবিষ্কার হয় সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। এই ধরনের পত্রিকাকে বলে **জার্নাল**। কাজেই একথা সহজেই বলা যায় যে বই ছাড়াও ছাপা যেসব বস্তু থেকে আমরা আমাদের দরকারি তথ্য পাই বা খবর জানতে পারি তার মধ্যে পত্রিকা ও খবরের কাগজ খুবই পরিচিত এবং জনপ্রিয়। সংবাদপত্র আর পত্রিকা দুটোরই একজন সম্পাদক থাকেন যাঁর ওপর দায়িত্ব থাকে কাগজ বা পত্রিকা চালানোর।

বইয়ের প্রচ্ছদ

আখ্যাপত্র

বই আর পত্রিকার মধ্যে কিছু তফাত আছে। বই একটা নামে সাধারণত একবারই ছাপা হয়। সব ছাপা বই বিক্রি হয়ে গেলে তবেই নতুন করে ছাপা হয়। যদি দ্বিতীয়বার ছাপার সময় বইতে আরো নতুন তথ্য যোগ হয় বা আগে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তার সংশোধন করে ছাপা হয় তাহলে বলা হয় বইটির দ্বিতীয় **সংস্করণ** প্রকাশ হলো। কিন্তু পত্রিকা একই নামে বছরের পর বছর একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশ হতে থাকে। সেটা বোঝা যায় পত্রিকার নামের তলায় বর্ষ আর সংখ্যা বলে দুটো কথা থেকে। ধরা যাক এই বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে একটা পত্রিকা হাতে পেলে যার নামের তলায় লেখা আছে— বর্ষ - ৭ আর সংখ্যা-৪, তারিখ দেওয়া আছে ফেব্রুয়ারি ১৬; পত্রিকাটি যদি পাক্ষিক হয় অর্থাৎ মাসে দুটো করে বের হয় তবে বুঝতে হবে পত্রিকাটি সাত বছর ধরে বের হচ্ছে। আর এই বছরে অর্থাৎ সাত বছরের প্রথম সংখ্যাটি বের হয়েছিল জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে; আর এই বছরে এর শেষ সংখ্যাটি বের হবে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে। তার পরিচয় হবে বর্ষ — ৭, সংখ্যা ২৪।

এবার নিজেরা খুঁজে বার করো :

১। বাংলা ও ইংরাজি ভাষার দুটি বিখ্যাত প্রকাশনার নাম।

২। বাংলা থেকে বাংলা ভাষার দুটি অভিধানের নাম।

৩। বেড়াতে যাবার উপযোগী একটি গাইডবই বা সন্ধানবই-এর নাম।

৪। একটি বাংলা ও একটি ইংরাজি সংবাদপত্রের নাম।

৫। সংবাদপত্রের কোন পাতায় কী কী খবর কেমনভাবে থাকে?

৬। দুটি ছোটোদের পত্রিকা ও একটি করে বিজ্ঞান এবং খেলাধূলা বিষয়ে প্রকাশিত পত্রিকার নাম।

বই পড়ার ডায়েরি

সংখ্যা	বই পড়ার তারিখ (শুরু থেকে শেষ)	বইয়ের নাম	লেখক	বইটার বিষয় বা ধরন	কোথা থেকে পেয়েছ বা কে পড়তে বলেছেন

শিখন পরামর্শ

- জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা -২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন -২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তকটি (ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা) রূপায়িত হলো। বইটির পরিকল্পনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিশিখনের পূর্বে শিক্ষক/শিক্ষিকা সযত্নে পুরো বইটি পড়ে নেবেন।
- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) **'আমাদের চারপাশের পৃথিবী'**। নানা কবিতায়, ছড়ায়, গানে, গল্পে, গদ্যে এবং ছবিতে কাহিনির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে আমাদের চারপাশের জগতের বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন দিক। পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের বর্ণময় জীবনের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে ঠিক তেমনই মানুষের জীবনের পালা-পার্বণ, উৎসব, বিনোদন, খেলা, মজা প্রভৃতি অবিচ্ছেদ্য বিষয়ও এর সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে। এর ফলে আমাদের দূর ও নিকটবর্তী জগতের প্রাণময় অস্তিত্ব শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। একই সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইয়েও আছে স্বদেশ ও স্বাধীনতা বিষয়ক গান, গল্প, এবং কবিতা।
- এই বইটির 'হাতে কলমে' অংশটিতে CCE পুস্তিকার বিভিন্ন দিকনির্দেশগুলি অনুসৃত হয়েছে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বিভিন্ন সূচক যেমন এই সমস্ত 'হাতে কলমে' অংশে ব্যবহার করা যাবে তেমনই পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যেরও প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মুক্তচিন্তা চর্চার পরিসর (Open Ended Learning Task), বিভিন্ন অর্জিত সামর্থ্যগুলি সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ জুড়ে চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকদের মূল্যায়ন বিষয়ে যাবতীয় অস্পষ্টতা দূর করতেই এই প্রয়াস।
- শিক্ষার্থীর সুবিধার কথা ভেবে বাংলাভাষায় অতিপ্রচলিত যে-শব্দগুলির দুটি অর্থ আছে, তাদের বানানে আমরা সামান্য পার্থক্য এনেছি। এইজন্য হতো, হলো, মতো, ভালো, করো, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর কবি, লেখক,লেখিকাদের নামের বানানের ক্ষেত্রে মূল রূপটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

'হ য ব র ল' বইটি গোটা বছর ধরে পড়াতে হবে। বইটির 'হাতেকলমে' অংশে কিছু নমুনা প্রশ্ন থাকল। এর সাহায্য নিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষক নতুন-নতুন প্রশ্ন উদ্ভাবন করবেন এবং এইভাবে সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ধারাটি বজায় রাখবেন।

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার সম্ভাব্য সময়সূচি ও পাঠক্রম :

মাসের নাম	পাঠের নাম	মন্তব্য
জানুয়ারি (প্রথম পর্যায়)	ভরদুপুরে, সেনাপতি শংকর, ● বই পড়ার কায়দা কানুন (২)	প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতার শিক্ষা।
ফেব্রুয়ারি (প্রথম পর্যায়)	পাইন দাঁড়িয়ে আকাশে নয়ন তুলি, আকাশভরা সূর্য তারা,মন ভালো করা (মেনি)	নদী, গাছ, পাহাড়, পর্বত,মরুভূমি ও মহাকাশ সমেত এই মহাবিশ্বের প্রতি ভালোবাসা ও কৌতূহল।
মার্চ (প্রথম পর্যায়)	পশুপাখির ভাষা, ঘাসফড়িং, কুমোরে-পোকার বাসাবাড়ি (আমার ময়ূর)	কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখিতে ভরা এই প্রাণময় জগতের প্রতি অনুসন্ধিৎসা ও অন্তরঙ্গতা।
এপ্রিল (দ্বিতীয় পর্যায়)	মরশুমের দিনে (খোজা খিজির উৎসব), হাট, দেয়াল চিত্র, ঝুমুর	পালা-পার্বণ, উৎসব, বিনোদন এবং দৈনন্দিনতার মধ্যে থেকে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির খোঁজ।
মে (দ্বিতীয় পর্যায়)	পিঁপড়ে, ফাঁকি	মানুষ ও প্রকৃতি।
জুন ও জুলাই (দ্বিতীয় পর্যায়)	উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা, চিত্রগ্রীব, আশীর্বাদ, এক ভূতুড়ে কাণ্ড, বাঘ,	চারপাশের নানান বৈচিত্র্যময় ঘটনার সঙ্গে পরিচয়।
আগস্ট (তৃতীয় পর্যায়)	বঙ্গ আমার জননী আমার, শহিদ যতীন দাস, চল রে চল সবে	স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার আনন্দ।
সেপ্টেম্বর (তৃতীয় পর্যায়)	ধরাতল (সেথায় যেতে যে চায়), হাবুর বিপদ (না পাহারার পরীক্ষা)	পৃথিবী, মানুষ, ও বিদ্যালয় জীবনের বৈচিত্র্য।
অক্টোবর ও নভেম্বর (তৃতীয় পর্যায়)	কিশোর বিজ্ঞানী, ননীদা নট আউট	খেলার মজা এবং অপরাজেয় কৌতূহল।

- দুমাস অন্তর বই পড়া নিয়ে কথা বলুন। প্রত্যেকের 'বইপড়ার ডায়েরি' অংশটি দেখুন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন।